সূর্যস্নান

শ্রীনীহার রঞ্জন সিংহ

: প্রাপ্তিস্থান :

১। ভারতী লাইব্রেরী, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২

২। বাণীরূপ প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

প্রকাশক,
শ্রীবিন্দ্রদিন্দু সিংহ
বাণীরূপ প্রকাশনী,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬২

মূল্য ৩৲

মুদ্রাকর :
শ্রীগজেন্দু সিংহ
নদীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসুনীল চক্রবর্তী
বাইণ্ডার :
সিংহ বুক বাইণ্ডিং
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

মা,

তুমিই আমায় দেখিয়েছ বিশ্বের আলো—

সেই আলোকে স্নান করে'

সূর্যস্নান

নিবেদন করি তোমারই শ্রীচরণে।

মহালয়া
১৩৬২

"নীহার"

শুদ্ধিকা

সূর্যস্নানের কয়েকটি সংশোধিত শব্দ। অঙ্কগুলি পৃষ্ঠা জ্ঞাপক।

১—নিঙাড়ি; পড়িবে। ৭—যান্ত্রিক; রেফ্রিজারেটর; জন্য। ১৩—আত্মারাশি। ১৯—ভূর্ভুবঃ। ২১—ভালো লাগা। ২৪—প্রতীক্ষায় ২৫, ৭৪, ৯৩—পাপড়ি। ২৮, ৬০, ৬১, ৮৪, ১১১—সত্ত্বা। ৩১—ভস্মীভূত। ৩২—জঙ্ঘা; ফণীসম। ৫৯—উজ্জ্বল। ৬১—জলরাশি। ৬৫—যুগান্তের। ৬৮—ক্ষীয়মাণ। ৭৮—আকাশ। ৮১—পৌছেনা। ৮৪—সত্তায়। ৮৯—সত্তার। ৯৩—যূথিকার। ৯৫—মিলিতে। ১০০—আণবিক; কারণ তত্ত্ব। ১০১—তত্ত্বের; সত্তা। ১০৩—ঘূর্ণি বাত্যার।

সন্ধান ঃ

সন্ধান ঃ

সার্থক হবে গান

নিরালায় শুধু তুমি আর আমি,
মুখোমুখি হয়ে বসিব,
শোনাবো আমার গান।
নিঙারি' নিঙারি' আমার গানের রস,
পরিবে ঝরিয়া তোমার শ্রুতির মূলে।

সে-গানে তোমার বর্ষার মেঘলোকে
চূর্ণ রোদের উঠিবে ইন্দ্রধনু।
মনের আকাশে মিলাবার আগে,
দু' ফোঁটা অশ্রু ঝরিবে নয়ন হ'তে,—
সার্থক হবে গান!

শেফালি ঝরার দিনে,
অতি প্রত্যুষে একাকী যখন ধরণীর আঙিনায়,
ফুলের গালিচা দেখিবে রয়েছে পাতা,—
আমার গীতির দু' চারিটি সুর,
ঝরাফুল দেখে উঠিবে জাগিয়া মনে—
সার্থক হবে গান!

মৃদু শিহরণ কোন্ দিন যেন,
দোলাবে আচম্বিতে,
ম্রিয়মাণ ভানু যখন লজ্জানত,
প্রণয়ীর মনে,
কি যেন পুলক অজানা বেদনা মাখা!
আমার গীতির অন্তর হ'তে
হেমন্ত দেবে টুকি!
যেবা তুমি হও, যে বয়সী হও,
আমার গানের মোহিনী মায়ায়
হইবে পঞ্চদশী,—
সার্থক হবে গান!

জরার দারুণ অকরুণ বেদনাতে
হলুদ-পাতার ঝরে যাওয়া দিনগুলি,
আমার গীতের বিধুর মূর্ছনায়,
দেখিবে জগত তোমারে কম্পনিকা,
সে কম্পনের থর-থর-সুর যদি
শিহরিয়া তোলে আমার গীতির গতি—
সার্থক হবে গান।

কোকিল কূজিত মাধবীর রাতে,
গোপন প্রাণের কথা,
যার কানে কানে বলো—

সে জানুক আর তুমি জানো তাহা,
যে-গান তোমায় শোনাই গোপন সুখে,—
সে-গানের সুর মিশে যায় প্রাণে প্রাণে,
যদি যায় তবে—
সার্থক হবে গান।

কলহ অন্তে ক্ষিপ্ত বুকের জ্বালা,
উন্মাদ হ'য়ে,
উড়াইয়া জটা ঘনঘটা মেঘভার,
ঈশানী ঝঞ্ঝা—দামিনীর দিকে ছোটে!
ভীতাতুর হও আমার গীতির ছন্দে,
বীভৎসতায় সর্বগ্রাসিনী রূপ
মোর গীতিকায় ফোটে যদি তবে জেনো—
সার্থক হবে গান!

তুমি আর আমি,
মাঝখানে মোর গান!
আর কেহ নয়, নহে আর কোনো জন,
হাজার মানুষ যেইখানে ভীড় করে,
সেখানে আমার গীতি,
বধির, অন্ধ, মূক যদি হয়,
তাও ভালো, তাও ভালো—
সার্থক হবে গান!

আমার জন্মভূমি

আমার দেশ, আমার দেশ!
যে দেশে আমি জন্মেছি—
জন্মেছি ব'লে সে দেশ আমার,
এ কথা নয়, এ কথা সত্য নয়!

দেশের পরিধি আমারি সৃষ্টি—
সারাটি পৃথিবীকে,
ভাবিতে তো পারি আমার জন্মভূমি—
জন্ম দিয়েছে এই পৃথিবীরই গর্ভ!

ব্যর্থতা ভরা এ আভিজাত্য জন্মভূমির তরে।
জন্মেছি বলে আমার স্বদেশ,
সংশয়হীন ব্যর্থ গর্ব এতো!

সৃষ্টি করেছে যে-জন আমারে
তারেও করিব সৃষ্টি;
একক জীবন, ব্যষ্টি জীবন, সমাজ জীবন তার,
মোর চিত্তের মঙ্গলময় ব্যাপ্তিতে হোক,
তাহার শরীরে প্রাণের উদ্ভাবন।

আমার প্রাণের শক্তি-অশ্ব,
উৎসাহ-হ্রেষা তুলি,
জন্মভূমিরে নিয়ে যাবে তার নূতন জীবনে,
নূতন আলোর পথে।

মধুর শান্তি প্রীতি আনন্দে
আলো করে যদি দেশ;
আমার জ্ঞানের প্রাণদ মন্ত্রে
যদি দেশ লভে প্রাণ,
তবেই সত্য সার্থক হবে
আমার জন্মভূমি;
গৌরবে আমি কহিতে পারিব,
আমার দেশ! আমার দেশ!

এই পৃথিবীর যতটুকু পারি,
যতখানি পারি, তমসা করিতে দূর,
যতটুকু হবে, যতখানি হবে,
সুন্দর শুভময়,
ততটুকু জেনো, ততখানি জেনো,
আমার জন্মভূমি!
উন্নত শিরে, গর্বিত বুকে,
হাসিভরা মুখে প্রচারের অধিকার
আপনার হাতে ধরিয়া বলিব—

বলিব সগৌরবে,
জন্ম লভেছি, জন্ম দিয়েছি,
সেইটুকু—ততখানি
আমার দেশ! আমার দেশ! আমার জন্মভূমি!

রাখী বন্ধন

স্তব্ধ সুন্দর নীরবতা।
মহানগরীর অধিবাসী আমি,
আমার সে কথা জানা নেই,
জানা নেই ওই স্তব্ধ সুন্দর নীরবতা।

আমি শুনি অনন্ত কলরব,
লক্ষ মানুষের কলধ্বনি!
তাদের কর্মব্যস্ত জীবনকে ঘিরে আছে
ট্রামের ঘড়্ ঘড়্ ঢং ঢং,
মোটর-বাসের ভোঁ ভোঁ,
হকারের নানা অদ্ভুত সুরের ধ্বনি,

আর দোকানে দোকানে রেডিওর
দিগন্ত-চিৎকারি গান,
কখনো বা সারা জগতের সংবাদ !
প্রচার বিভাগের লাউড স্পীকার
ভীষণ শব্দে বলে যায় তার কথা,
পৌঁছে দেয় তা লক্ষজনের কানে।
নিদ্রা ভঙ্গের আগে আরম্ভ হয়
—সূর্যোদয়ের প্রহর খানেক আগে—
আর গভীর রাত পর্যন্ত,
ঐ মহাশব্দের একটানা অভিযান।
জানতে পারিনে, স্তব্ধতা কাকে বলে।
আমার জীবনের সাথে ওদেরি চির পরিচয়।
আমিও যেন ঐ শাব্দিক তরঙ্গে মিশে গিয়ে
হারিয়ে গিয়েছি ওদেরি মধ্যে।

যান্ত্রিক প্রভাব ভেসে যায় আমার জীবন-স্রোতে,
আকাশে দেখি এরোপ্লেন,
মাটিতে ট্রেণ, ট্রাম আর হাজারো ট্রাফিক,
নদীতে সাগরে ভেসে চলে, ডুবে চলে যন্ত্রের জাহাজ।
বিজ্‌লী হিটারের পরিচয়,
ভুলিয়ে দেয় কাষ্ঠের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা,
রেফ্‌রিজেটার ভুলিয়ে দেয় পচন ব্যাধি !
পশুপক্ষী জানোয়ারের পরিচয় উত্তর বংশের জন্য

বাঁধা আছে চিড়িয়াখানায়—আর একজিবিশনে !

জীবনের প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা,
মানুষে মানুষে আন্তরিকতা—
ওরা কোন্ গোপনে বাসা বেঁধেছে
খুঁজতে হয়।
খুঁজে পাইনে তাদের সিনেমায়, রেস্তোঁরায়,
খুঁজে পাইনে তাদের গানের জলসায়,
বেতার অনুষ্ঠানে আর ভোজের টেবিলে !
বিলাসে, ব্যসনে, মিলনের [illegible]নে,
যন্ত্রের পরিচিতি
বস্তুতন্ত্রের শুষ্ক মরুতে !
সেখানে প্রাণ আছে,
খুঁজে পাইনে প্রাণের ধর্ম !
[illegible]তের প্রবলতম গতিবেগ,
শুধু এগিয়ে দেয় আকাঙ্ক্ষার মরীচিকায় !
ওদের অনন্ত শব্দ-তরঙ্গে ডুবে যাই,
মোহাচ্ছন্ন কানে শুনতে পাই ওদের ডাক !
ওরা বারণ করে, তবু কখনো বা
নিজের বুকে হাত দেই,
খুঁজে পাইনে বুকের শব্দ।
হারিয়ে গিয়েছে তা,
ওই মহাশব্দের অতল তলায়।

হঠাৎ এলাম সহর হতে দূরে—বহু দূরে।
একি, এ আবার কোন দেশ?
এখানে কেবল—চুপ্ চুপ্।
কথা নেই, শব্দ নেই, কোলাহল নেই।
নেই যন্ত্র-জীবনের উত্তাল তরঙ্গ।
যে-কথা আছে, যে-শব্দ ঘুরে বেড়ায় আকাশে বাতাসে,
তাতে আমার বুকের শব্দ তলিয়ে যায়না।
বরং মিতালি করতে চায় তাদের সঙ্গে।
এ যেন আর একটা পৃথিবী,
মানুষের গড়া পৃথিবীর সঙ্গে নেই কোন যোগ।
এখানে ঘুরে বেড়ায় প্রীতি প্রেম স্নেহ মমতার স্নিগ্ধতা;
কান পেতে থাকলে শোনা যায়,
বনে জঙ্গলে মিহি গলায় ডাকে—দোয়েল আর চন্দনা,
কোথাও শাপ্‌লা ফোটা পুকুরে হাঁসের সাঁতার,
তাদের পাখা ঝাড়ার শব্দ।
নদী-তীরের বালুচরে হিট্‌টিটি গাঙশালিক আর ময়না,
আন্তরিকতায় ভরা নিস্তব্ধ নিঝুম গ্রামের পথ।
বাউল গেয়ে যায় তার গান,
হাতে বাজে একতারা।
সামনের বাড়ীর একটি মেয়ে
বাল্‌তি নামায় কুয়ায়।
বাল্‌তির জল কুয়ার ভেতরেই উছ্‌লে পড়ে,

ছলাৎ ছলাৎ।
দু চারটি ছেলেমেয়ে লাফালাফি করে রাস্তায়,
তাদের কণ্ঠে আর কতটাই বা শব্দ;
বাঁশ গাছের পাতার ফাঁকে,
ঘুঘু ডাকছে একটা—ঘুঘূ-ঘুঘূ-ঘুঘূ।
এদের সকলের সমবেত কলরবও
আমার কানের নিঝুম নিরবতা
ভাঙতে পারছে না।
ঃ মহানগরীর শব্দ শোনা কান।ঃ

সামনে একটা বিরাট বটগাছ,
তারই শীতল ছায়ে, ঘাসের আসনে-বসে,
চুপ্ করে দেখি আর শুনি,
ভাবতে চেষ্টা করি সহরকে।
ভাবতে থাকি এই নিস্তব্ধ পুরীর কথা।

দূরে মাঠে, কৃষক লাঙল চালায়,
পাশে তার দেখা যায়,
খামারে কাজ ক'রে চলেছে কৃষক বধূ,
রাখালেরা মহিষের পিঠে ব'সে বাঁশী বাজায়।
ভাবতে থাকি এদের কথা।
মনে হয় আমি মরে গিয়েছি।

শব্দ-সংস্কারে ভরা নাগরিক মনকে
যেন তার বাইরে নিয়ে যেতে চায়।
বুঝতে পারিনে, সন্দেহ হয় আমাকে।
এ কি আমার নূতন জন্ম!
খুঁজে বেড়াই আমার পুরানো আমিকে,
আর নূতনের সাথে পুরাতনের মিলন ঘটাতে চাই।
কোলাহলহীন পল্লীর সাথে,
প্রাণকেন্দ্রিক পল্লীর সাথে
বস্তুকেন্দ্রিক নগরের ঘটাতে চাই মিলন।
বাঁধতে চাই প্রীতির রাখীবন্ধন।
তবেই যেন বুঝতে পারি, আমি বেঁচে আছি,—
জন্ম নিয়েছি নূতন করে।

বিশ্বলীলা

বিশ্বলীলা রূপে রূপে মহারূপময়,
অনাদি অতীত হ'তে অন্তহীন দূর ভবিষ্যতে,
সংখ্যার অতীতরূপ আপনার অঙ্গে অঙ্গে ঘেরি,
হাসিছেন পরমাপ্রকৃতি ওই আপনায় আপনি বিকশি।

আলোর প্লাবনে ভাসি দূর বা নিকটে,
ছুটিছে রূপের ঢেউ স্থলে জলে অন্তরীক্ষে
পারাবার-বুদ্‌বুদের সম।
ফুটিছে টুটিছে আর টুটিছে ফুটিছে,
ডুবিছে ভাসিছে আর ভাসিছে ডুবিছে,
জন্ম-মৃত্যু-মহাকাল-সিন্ধু বুকে তারা।
জন্ম, স্থিতি, প্রলয়ের মাঝে,
স্থিতির ক্ষণিক রূপ-সুধা,
সপ্ত রঙ্গে সপ্ত সুরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোরে
অনন্ত বিশ্বের গতি লয়ে।
স্থিতিবান চক্ষুষ্মান অহরহ করে পান
দৃষ্টিগ্রাহ্য-মদিরা-আসব সম, সেই রূপ সুধা।

জন্মক্ষণে
সে চাহিয়া দেখে তার আত্মীয় স্বজন,

স্থিতির দেবতারূপে বিরাজিছে বিশ্বময়,
তাহারই মধুরতম চূর্ণ আত্মারাশী।
নয়ন পল্লব তার বিস্ময়ে অবাক
নিমীলিত হয়, পুনঃ হয় উন্মীলিত—
আত্মভোলা দৃষ্টি তার ঈক্ষণ করিতে থাকে
আপনারই স্থিতির বৈভব।

পুনঃ হেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলি আচম্বিতে,
দক্ষিণের দুয়ার খুলি তাহারি স্বজন,
কোটী কোটী আরো কোটী—ক্ষণে ক্ষণে পড়িছে ঢলিয়া
স্থিতির একান্ত দেশে প্রলয়ের অনন্ত গভীরে।

পুনরায় লভি জন্ম গতানুগতিক,
অনন্ত রূপের মাঝে অভিনব রূপে,
স্থিতির ক্ষণিকানন্দে চেয়ে রয়,
আত্মহারা দৃষ্টি তার অনন্ত আত্মায়।

গতিধর্মী ব্রহ্মাণ্ডের এই এ-জীবন-স্বাদ,
নিত্য করি পান,
আসি যাই কালচক্রে,
কিছুকাল থাকি,
গেয়ে যাই বিশ্বরূপ গান।

মেহগনির কায়কল্প

মেহগনি,
তুমি দুশো বছর দাঁড়িয়েছিলে,
ওই মাটি-জননীর বুকে।
অজানা কোন্ অতীতের সেই দিনটিতে,
শিশু-মেহগনিরূপে তোমার আবির্ভাব।
হয় তো বা শিহরন এনেছিল
মৃত্তিকার অন্তরে,
তোমার ছোট্ট শিকড়ের প্রবেশ মাধুর্য।
তারপর,
দীর্ঘদিন ধরে' মাটির গভীরে,
যেমন তুমি করেছ রস সংগ্রহ,
তেমনি ধীরে ধীরে,
মহীরূহের রূপ নিয়ে,
আকাশ পথে ছড়িয়েছ, তোমার শাখা প্রশাখা,
আর অজস্র পত্র-সম্ভার।

তোমার যৌবনে পেয়েছিলে প্রকৃতির ভালবাসা--
ভালবাসা, আর তার স্নেহের অত্যাচার।

তারা ঋতুতে ঋতুতে,
করেছে তোমায় চঞ্চল,
কখনো বা ক্ষুব্ধ, কখনো বা স্তব্ধ।

কাল বৈশাখের তাণ্ডবতা সহ্য করেছ,
সহ্য করেছ নিদাঘের মরুতৃষ্ণা।
কখনো বা বর্ষার ধারায় হয়েছ তুমি স্নাত।
দু'শোটা বসন্ত, শীত আর
গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, শরৎ
তোমায় আলিঙ্গন ক'রে,
নিষ্পেষিত করেছে;
কখনো বা জানিয়েছে প্রীতির অভিনন্দন।
তোমার অটুট ধৈর্য ভ্রূক্ষেপ করেনি,
এদের দেওয়া সুখ দুঃখ;
অথবা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছ তাদের!

তুমি ছিলে ধরিত্রী-জননীর,
বন-সম্পদের শ্রীবনস্পতি।
তবু একদিন,
লুব্ধ মানুষের কঠোর কুঠার তোমায় করলো ছেদন।
চরম ধৈর্যের পরম বিস্ময়,
তুমি করলে না কোন প্রতিবাদ।
জীবনাবসানে লুটিয়ে পড়লো তোমার অঙ্গ,

ধরার শ্রীঅঙ্গনে—
সন্তান-হারা মূক ধাত্রী-জননীর বুকে।
সেও করলো না কোন প্রতিবাদ।

তারপর,
চল্‌লো তোমার মৃত দেহটার সঙ্গে,
যন্ত্রদানবের একতরফা সংঘাত।
ব্যবচ্ছেদিত হ'লো অঙ্গ।
তুমি নীরব—নিথর।
অন্তর্জ্বালা হয় তো তোমার ছিল,
নয় তো ছিল না,—
হয় তো কান্না গিয়েছে তোমার শুকিয়ে;
অথবা, আত্মদানের দধীচি-মন্ত্রে,
আহ্বান করেছ, অনৃতের ধ্বংস—
আত্মধ্বংস।
কিম্বা করেছ সুন্দরের উপাসনা,
সৌন্দর্যের স্তব স্তুতি,
তোমার অস্থিতে অস্থিতে
মৃত্যু বরণ ক'রে
মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার বাসনা,
নবরূপে নব কলেবরে।

তাই বুঝি,

তোমার দেহের আনাচে কানাচের
গুপ্ত সৌন্দর্য, মানুষের অভীপ্সায়,
প্রকাশিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে,
তার ঘিস্‌কাবে আর পালিসে।
তোমার দেহাস্থিতে,
বাড়িয়েছ তার ভবন-সৌন্দর্য।

হয় তো বলতে পার মেহগ্‌নি,
এই ছিল তোমার জীবনের চরম আকাঙ্খা,
পরম পরিণতি।
তবু আমি তা করবো না স্বীকার।
বায়ু আর জল, মাটি আর আলো,
যে-জীবনকে দুশো বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে,
তার বেঁচে থাকার অধিকার,
কেমন ক'রে অস্বীকার করে মানুষ?
কেমন ক'রে তাকে হত্যা করে?
তার সৌন্দর্য লুণ্ঠন করে তারা?

তুমি হয়তো বল্‌বে,
—এ লুণ্ঠন নয়, হত্যা একে বল্‌বো না,
ধ্বংস দিয়ে সৃষ্টি,
এ আমার নব জন্ম,
এ আমার যৌবন-বিকাশের কায়কল্প।—

এ কথা স্বীকার করলেও,
আমি জানি মেহগনি,
তোমার জীবিত কালের অবচেতন মন,
মানুষের এই সৌন্দর্যবোধকে আশীর্বাদ করেনি,
করেছে শুধু তিরস্কার আর অভিসম্পাত।

ক্ষুধা

উন্মুখ ইন্দ্রিয় মোর
ক্ষুধায় কাতর!
জনমে জনমে সেই সীমাহীন ক্ষুধা,
আমারে ঘেরিয়া চলে
আত্মীয়ের মত,
গভীর নিদ্রায়, কভু, কি অবচেতনে,
তন্দ্রা ঘোরে স্বপনের মাঝে,
কভু বা জাগ্রত মনে,
সহস্র সে মায়ারস পান করিবারে
অন্তরের বাহু ধরি',
লয়ে যায় তৃষিত এ হিয়া,

পিয়ায়িতে বাঞ্ছিত মদিরা।
কবে কোন আদিকাল হতে
জগতের সর্ব রস, সর্ব রূপ, সর্ব গন্ধ গান,
আমারে বাসিয়া ভালো,
দিতে আসে প্রীতিভরা প্রেম আলিঙ্গন,
প্রথম মিলন-লুব্ধ দয়িতের মত।

নিতান্ত সহজে পাওয়া,
নিশ্বাসের বায়ু হতে,
তৃণ, লতা, গুল্ম, মহীরুহ,
প্রাণময় ভূচর, খেচর, জলবাসী,
আমার সমাজ বন্ধু বান্ধবীর দল,
সর্বজন নিত্য চাহে,
করিবারে তৃপ্তি সম্পাদন,
মোর সর্ব ইন্দ্রিয়ের।

সমগ্র পৃথিবী, ব্যোম, অসীম আকাশ,
অনন্তের অন্তহীন গ্রহ, উপগ্রহ,
চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের সাথে,
ধূমকেতু, নীহারিকা, অরোর‍্যা নিচয়,
আমার ইন্দ্রিয় ক্ষুধা, অবসান তরে,
যুগে যুগে আছে অপেক্ষায়।
ভূর্ভুব স্বঃ আদি,

লোকে লোকে মোর আমন্ত্রণ,
সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ের মিটাইতে ক্ষুধা।

উন্মুখ ইন্দ্রিয় মোর,
ক্ষুধায় কাতর।
ভূমিষ্ঠের সাথে সাথে,
প্রথম নিশ্বাসে,
হইয়াছে ক্ষুধার উদ্রেক।
রসনা চেয়েছে দুগ্ধ, মাতৃস্তন হতে।
ধীরে ধীরে,
অসহায় আঁখি দুটি
চাহিয়াছে স্নেহমায়া,
হতে মাতৃ আঁখি!
বাল্যে কত ক্রীড়নক,
তার সঙ্গী হয়ে,
ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে আমার চিত্তের!
যৌবনে ফুটেছে ফুল,
আমার সহস্র দিকে,
নানা রঙ্গে, নানা গন্ধে, পেলব পরশে!
উচ্ছ্বসিত বসন্তের
কামগন্ধী কত, সফেন মদিরা
করায়েছে পান মোরে আমার যৌবনে!

মর্মে মোর তার সাথে,
সুন্দরীর বেশে,
তন্বীবালা মহীরাণী,
বিশ্বের সকল অক্ষি দিয়া,
ইসারা ইঙ্গিতে,
আমারে বাসিয়া ভালো,
করায়েছে প্রীতি সুধা পান!
জীবনের সেই মহাক্ষণে,
মর্মে মোর,
যে এসেছে, যে হেসেছে,
আঁখির কটাক্ষ মোর আঁখিতে হেনেছে,
তারেই লেগেছে ভাল!

এই ভাললাগা আর এই প্রীতি প্রেম,
অনন্ত বিশ্বের সনে আমারে মিলায়ে,
আমার চিত্তের ক্ষুধা,
নিবারিতে করায়েছে পান,
বাসনা কামনাহীন,
জাগ্রতে ঘুমানো, কিম্বা,
নিদ্রায় জাগানো,
মহাচেতনার কোন্
এক বিন্দু সুধা!
অঙ্গের ক্ষুধার সনে,

এই চিত্ত-ক্ষুধা
বাড়িয়া চলেছে নিত্য
অনন্তের পথে !
এই ক্ষুধা, চিত্তে মোর জাগে যেন,
মহাবিত্ত রত্ন পারাবার !
এই মহা ক্ষুধা সিন্ধু,
মন্থন করিয়া নিত্য,
উঠিতেছে অমৃত লহরী !
সে-অমৃত করি পান
চলে যাই অনন্তের অমৃত সন্ধানে !

এই ক্ষুধা শিখায়েছে
স্নেহ প্রীতি প্রেম ;
আত্মার তৃপ্তির তরে
এই ক্ষুধা,
বিশ্বজনে বাসিয়াছে ভালো,
এই ক্ষুধা,
সবা মাঝে বিলায়ে আপনা,
সর্বলোক আকর্ষণ করিছে আত্মায়,
যুগে যুগে, জনমে জনমে !

বিশ্বের বাউল

অনাদি অতীত,
ক্ষণিকের বর্তমান,
আর অন্তহীন ভবিষ্যৎ,—
এদের নিয়ে এক অখণ্ড মহাকাল !
এই মহাকালের রঙ্গমঞ্চে,
রবি, শশী, তারা, গ্রহ-মণ্ডল,
আর ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,
পরম সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম,
আর বৃহৎ হতে বৃহত্তর, বৃহত্তম,
যারা,
আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচরিভুত,
কিম্বা,
জ্ঞানের বাইরে, ধারণার বাইরে,
তাদের চলেছে অভিনয় !

জন্ম স্থিতি মৃত্যু নিয়ে,
এদের চলে নিত্যকালের পট পরিবর্তন !
কখনো বা ওঠে যবনিকা
দৃশ্যের জৌলসে,

কখনো বা হয় যবনিকার পতন
মহা অতীতের অনন্ত নীরবতায়!
মানুষ তার নিতান্ত জ্ঞানের অক্ষম মাপকাঠিতে
মেপে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায়,
এদেরই অন্তর নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ব!
খুঁজে বেড়ায়, এদের স্রষ্টা কে?

ক্ষণিকের গান গেয়ে চলে বর্তমান!
অবগুণ্ঠন উন্মোচনের মহা প্রতিক্ষায়,
ঢাকা থাকে,
অনাগত সুন্দরীর সর্বাঙ্গ!
আর চিরাবগুণ্ঠনে অতীত সুন্দরী,
ঢেকে ফেলে তার বদন!

বৈজ্ঞানিক, কর তুমি এদের বিশ্লেষণ,
ঐতিহাসিক, কর তুমি কালের নির্ণয়,
লিখে রাখো এদের জন্ম মৃত্যুর সাল তারিখ।
দার্শনিক, খুঁজে বেড়াও এদের যোগসূত্র।
কবি পান করুক এদের রূপ, রস, আর গন্ধ,
আর বাজিয়ে চলুক
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি বস্তু প্রাণীর,
কাল ধর্মাতীত,
অনন্ত বিচ্ছিন্ন রূপকে,

সুরের রূপে বেঁধে নিয়ে,
তার একতারায়।
সে জানে, ফুলকে ছিঁড়ে,
তার গন্ধ, তার রস,
তার পাঁপড়ী-রেণুর বিভিন্নাবস্থা,
বিশ্লেষণ করতে পারে বৈজ্ঞানিক,
একীভূত করে দেখতে শেখেনি তার রূপ।
হৃদয়ঙ্গম করতে শেখেনি,
তার সর্ব সমন্বয়ের প্রাণ-ধর্ম।

এম্‌নি মহাজগতের,
প্রতিটি রূপে,
প্রতিটি সৃষ্টির অন্তরে,
আছে, যে-মিলনাত্মক পরম সৃষ্টির বৈচিত্র্য,
সেই,
সর্ব বিশ্ব, সর্ব সূর্য, সর্ব গ্রহ,
সর্ব উপগ্রহের প্রাণ ধর্ম,
যে সূত্রে আছে বাঁধা,
চিরন্তন মহাকালের বুকে,
সেই সুতার তারে বেঁধে নিয়ে একতারা;
তার সেই মহান তারে,
কবি তার হৃদয়ের অঙ্গুলি পরশে,

তোলে নিত্য প্রাণের স্পন্দন।
এক সূত্রে গাঁথা সেই প্রাণের সঙ্গীতে,
ফুটিয়ে তুলতে চায় কবি,
স্রষ্টার অচিন্তনীয় মূর্তি।

আপনাকে ভুলে যায়,
মিশিয়ে যায়,
ঐ একতারার গানে।
'কে আমি' করে না তার অন্বেষণ।
খুঁজতো যদি,
বুঝতো তবে কবি,
একতারা হাতে নিয়ে কবি নিজেই,
এক মহা আনন্দের প্রতীক,
নিজেই সে মহাকাল বিশ্বের বাউল।

পূর্ণশশী

তুমি কি এ পৃথিবীর সকল মাধুরী,
সকল সৌন্দর্য দিয়ে করেছ রচনা,
তোমার ও-তনুখানি ?
সর্ব রসে করেছ সিঞ্চন,
জগতের যত রস, যত মধু সুধা,
তোমার হৃদয় ভরে' রেখেছ সকলি।
তুমি কি গো বিশ্বময় একক উর্বসী,
ওগো পূর্ণশশী !

তোমারে বেসেছি যবে ভালো,
বর্ষা স্নাত নিশিগন্ধা,
হাস্নুহু, কেতকী,
শরতে শেফালী, পদ্ম আর রক্তজবা,
হেমন্ত-শীতের কুন্দ, গাঁদা ও গোলাপ,
বসন্তের প্রেমগন্ধী পুষ্পের সম্ভার,
যাহারা তুলেছে মনে আনন্দের ঢেউ,
তাহাদের মাঝে আমি দেখেছি তোমায়,
চলেছ—চলেছ তুমি,
হাসির অমিয়ধারা বরষি' বরষি'
ওগো পূর্ণশশী !

মোর প্রতি পদক্ষেপ,
তোমারি চরণ চিহ্নে লভিয়াছে পথের সন্ধান।
দুর্গম গিরির বক্ষে বন্ধুর উৎপল,
হিমাদ্রির শীর্ষচূড়া কভু,
ক্লান্তি যবে আনে মোর সর্ব অঙ্গ ঘেরি,'
সে ক্লান্তিও লাগে ভাল,
সে যে তব,
শিহরিত তনুমার মোহন পরশ!
সাহারার জ্বালা, তাও, দেয় যে ভুলায়ে,
ওয়েসিস্ তার মাঝে ত্রিবলী তোমার।
পাহাড়, প্রান্তর, মরুদেশ,
সুগভীর বনানীর বিচিত্রতা মাঝে,
বিকশিত তুমি পূর্ণ, হে আশ্বাসময়ী!
তোমার মধুর বিম্বাধর,
প্রস্ফুট হয়েছে জানি,
নারী-নর প্রত্যেক চুম্বনে!
সাগরের সফেন সে-তরঙ্গ বলয়,
তব অঙ্গ বিচ্ছুরিত প্রেম-জ্যোতিকণা!
আকর্ষণ করিতেছ সর্ব প্রাণে বসি,
ওগো পূর্ণশশী!

তুমি কি ছড়ায়ে দিয়ে,
আপনার সত্বাটুকু ওগো,

বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে গেছ?
অথচ একান্তে মোর নির্জন কুটিরে,
আছ তুমি অধিষ্ঠাত্রী প্রিয়তমা রূপে,
নিতান্ত আপন জনে,
হৃদয় বিলায়ে দিয়ে উঠেছ হরষি,
ওগো পূর্ণশশী!

নিশীথের অন্ধকারে দেখেছি তোমায়,
লক্ষ তারকায়,
জ্যোৎস্নার পুলক প্লাবনে,
তোমার প্রেমের ঢেউ লেগেছে আমার,
জীবনের সাগরের মাটী-ছোঁয়া-কূলে।
দীপ্তিভরা রবি রশ্মি তুমি,
জীবনের দ্বিপ্রহরে,
উজলিত করেছ আমায়।
গোধুলিতে লজ্জানত সান্ধ্য আভাখানি,
দেখেছি তোমার চোখে।
নববধূ রক্তরাগে নিশার গুণ্ঠন খুলি,
লাজ-নম্র তুমি যে উষসী,
ওগো পূর্ণশশী।

চেয়ে দেখি এ সংসারে, বাস্তব তোমায়,
তোমার ও-তনুমার পেলব পরশ,

তোমার হাস্তের মধু নির্ঝর উৎসব,
আমার এ জীবনের আনন্দ ফোয়ারা।
কর্মময় এ প্রাণের
প্রিয়ারূপে, সাথীরূপে তাই,
তোমার বীণার তারে ওঠে যে ঝঙ্কার,
সে ঝঙ্কারে,
মোর বীণা বেজে ওঠে,
বিশ্ববীণা সাথে।
এক হয়ে যায়,
প্রভাতের দ্যুতি আর তোমার নয়ন।
তাই তো প্রেয়সী মোর,
ধরার সঙ্গিনী,
মহানন্দে চেয়ে রই,
জীবনের মুক্ত বাতায়নে
সবিস্ময়ে বসি,
ওগো পূর্ণশশী।

নারী

প্রকৃতির আকর্ষণে মোহমুগ্ধ জীবন-যৌবন!
আত্মহারা পুলকিত অন্তরের সহস্র কামনা,
উন্মুখি ছুটিছে প্রতিক্ষণে।
বিরহের অসংযত উন্মাদনা মাঝে,
অনন্তকালের নৃত্যে নাচে শিব তাথৈ তাথৈ—
কোথা সতী, সতী কোথা, খোঁজে আত্মভোলা!

বিরহের বহ্নিমান তপ্তস্রোত ভেদ করি আসে,
মিলনের সুখস্পর্শী অমৃত-আস্বাদ,
মোহিনী মূরতি লভি উমা দেয় প্রীতির পরশ!
—ভস্মিভূত পঞ্চবান-পতি।
পুরুষেরে করি ক্ষয় মৃত্যু আলিঙ্গিয়া,
হেসে ওঠে সৃষ্টির সুন্দর।

নিষ্পীড়িত পুরুষের মৃত্যুরে মথিয়া,
প্রকৃতির সুধাভাণ্ড হ'তে,
জন্ম লভে কার্ত্তিকেয়, নবসৃষ্ট নবীন পুরুষ।

*　　　　*　　　　*

সে প্রকৃতি তুমি নারী, জগন্মোহিনী।
প্রলয়েরে বক্ষে করি, চুম্বিয়া মৃত্যুরে,

অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি সৃষ্টির মন্দিরে।
তোমার চরণে বাজে চঞ্চল নূপুর,—
সুললিত কটি জঙ্ঘা, প্রেম-পারাবার—
নগ্ন বক্ষে সুকঠিন পীন পয়োধরে,
ওষ্ঠাধরে, অক্ষির ঈক্ষণে,
পুরুষেরে কর আকর্ষণ।
আজানু লম্বিত কেশ, পৃষ্ঠে দোলে ফণিসম,
পুরুষের তরে যেন বাসুকী-বন্ধন।

তুমি নারী নর্মদা-মোহিনী,
শক্তিময়ী মায়ারূপী,
পুরুষেরে দেখায়েছ অনন্ত সৃষ্টির রূপ,
মহামৃত্যুমাঝে,
অঞ্জনিয়া মোহের কজ্জল।
তাই তো বিরাজো তুমি,
সনাতনী মরণের কারণস্বরূপা,
শ্মশানচারিণী নারী নৃমুণ্ডমালিনী।
তাই তো বিরাজো তুমি,
অভয়ারূপিণী উমারূপে
বিশ্বপ্রসবিনী,
সম্রাজ্ঞীর সমা
সৃষ্টির ঐশ্বর্য বুকে মহিয়সী নারী।

স্বয়ং সিদ্ধ

আনন্দের অগ্রদূত সৃষ্টির বেদনা !
সম্ভাবনা জন্ম দেয় সংযত বাস্তবে,
ব্যর্থতার আবরণ ভেদি !

সম্ভাবনা সত্য যদি,—
সৃষ্টির বেদনা মাঝে
আনন্দের পরম উদয়—
চরম সার্থক হয় বেদন তাদের।
কিন্তু যদি অর্থহীন,—
সম্ভাবনা অসম্ভবে লীন।
তাহাদের মর্মে জাগিতেছে।

নিরর্থক কত হয় গর্ভের বেদনা,
সৃষ্টির পূর্বাহ্ণে আসে
মৃত্যুর সংঘাত।
পুষ্পভারে লতা-দেহ ন্যুব্জ বেদনায়,
ফলের আনন্দ-আশা
বক্ষে করি হাসে।

তবু—তবু, শত পুষ্প ঝরে ভূমি পরে,
ব্যর্থ হয় অন্তর কেশর।
ব্যর্থ হয় সৃষ্টির বেদনা।
ফলভারে দৃশ্যমান আলেখ্য নবীন,
চিরদিনই রয়ে যায় চক্ষু অন্তরালে,
সম্ভাবনা অসম্ভবে লীন হয়ে যায়,
জন্মলাভ করে না বাস্তব।

মিথ্যা দিয়ে গড়া এরা
চির সত্য জানি।
সৃষ্টির বেদনা আর
সম্ভাবনা যত,—
ভবিষ্যত মিথ্যা ইহাদের।
তবু এ-মিথ্যার মাঝে
আনন্দের আছে অবকাশ।
বর্তমান সত্য ইহাদের।
সত্য হয়ে ওঠে যত পুষ্পের পরিধি,
হোক ফলহীন ফুল,
সার্থকতা কুসুমের আপন-প্রকাশে।

সম্ভাবনা মাঝে বহে,
আনন্দের উষ্ণ প্রস্রবণ ;
আশার মোহিনী মূর্তি
মিথ্যাবুকে সত্য হয়ে নাচে।

বর্তমান মানে এরা,
ভবিষ্যত চাহেনা জানিতে,
এরাই স্বয়ং সিদ্ধ,
আপনায় আপনি সার্থক।

বেদন-তীর্থ

বেদনার তীর্থভূমি এ-ভূমি আমার!
জনমের পর হতে মৃত্যুর যে-ক্ষণ,
জীবনের এ পরিক্রমায়
তমসার অন্ধপথ বন্ধুর সর্পিল,—
সেই পথে যাত্রা মোর
চলে নিরন্তর,
বেদনার দেবতারে সম্মুখে রাখিয়া।

তবু জানি জয়যাত্রা,
জন্ম পরে কোথা কোন আলোকের দেশে;
সেথায় বেদনা নাই,
নাই কোন সুখ,

আকাঙ্ক্ষা আশার আলো নাই,
নাই কোন ব্যাকুলতা—
তমসার রেখা।

সেই-সে বাসনাহীন সুন্দরের সহজ চেতনা,—
তারি দিকে লক্ষ রাখি',
আজিকার বেদনারে তীর্থ বলে মানি।

যেই দিন বেদনার হবে জয়,
আমার সে অনাগত দিনে,
সেই দিন সত্য হবে,
বেদনার তীর্থখানি মোর।

শাশ্বত জীবন

কবে কোন প্রথম উষায়,
আঁধার সাগর বুকে স্মিত হাস্তে ফুটেছিল আলো।
সে-আলোকে দেখেছিনু আদিম ধরণী,
প্রথম জনম লভি,
আমি সেই আদিম মানব।

সে-দিনের আকাশে বাতাসে,
সে-দিনের স্থলে জলে, আঁধারে আলোকে,
আমরা ছিলাম যারা,
কেমন ছিলাম ?
নবীন সে-পৃথিবীরে,
সূর্য, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ কত-না বাসিয়াছিল ভাল ?
ধরিত্রী-শিশুর তরে,
তাহাদের কতনা উদ্বেগ !
কেহ আলো, শব্দ কেহ, কেহ আকর্ষণে,
ধরিয়া রাখিয়াছিল মোদের পৃথ্বীরে !
সে-অবনী অঙ্কে ছিনু,
অনু রেণু কণিকার রূপে,
তবু ছিনু স্বতন্ত্র জীবন ধর্মী

আমি মোর আপন সত্বায়—
বিশ্ব-অংশ-পরম প্রতীক !
সে-জীবনে যা-ই দেখে থাকি,
বিশ্বের সে আদিম উষায়,
সেই সে-অতীত যুগ চির বর্তমান,
আমার শাশ্বত এই প্রাণে !

শুধু তার বর্ধমান রূপ,
দিনে দিনে, কালে কালে, রূপান্তের বহু রূপে,
হয়ে চলে এ পরিবর্তন !
প্রাণ-ধর্ম যুগে যুগে স্থির হয়ে আছে !

শিশু 'আমি' যৌবনের 'আমি'কে কহিছে,
'মৃত্যু মোরে করেছে হরণ',
যৌবন বৃদ্ধেরে কহে, 'আমি আর নাই।'
মিথ্যা কথা !
প্রাণ-ধর্ম শাশ্বত সুন্দর,
শিশু যুবা বৃদ্ধ নাহি তার।
অনাদি অব্যয়রূপে,
ধরিত্রীর প্রথম উষায়,
'যে-আমি' হাসিয়াছিল ধরণীর ক্রোড়ে,
অপলকে যে চাহিয়াছিল,
অনন্তকালের তরে, গ্রহে গ্রহে, তারায় তারায়,

তার সে মানসী গতি,
চলে আর চলে শুধু, বিরাম বিহীন!
সে আদিম দেবতা যে আমি,—
সে মানব আমি!

তাই হেরি সে-দিনের সেই নব উষা,
আজিও নবীন হয়ে,
প্রতিদিন নিশীথের আঁধার ভেদিয়া,
বহাইছে আলোর প্লাবন!
অসীম অতীত আর, নিত্য বর্তমান,
অন্তহীন ভবিষ্যত,
এক সূত্রে গাঁথা হয়ে ফুটিছে সম্মুখে,
স্মরণ করায়ে মোর শাশ্বত জীবন।

সেই সুর-সেই সুর

জনমে জনমে, যুগে যুগে, কালে কালে,
সুর চলে' আসে অনাদি অতীত হতে'
আজিকার এই দিনে,
আমারই সে-সুর, আমারই সে-সুর জানি!

কথনো সে-সুর শান্ত স্নিগ্ধ অলস আবেশে ভরা,
প্রচারে প্রেমের বাণী,
মিলন-সভার পরিবেশ এনে দেয়,
বিশ্ব প্রেমের ইঙ্গিত সাথে সাথে।
সংসারে নাই জ্বালা যন্ত্রণা কিছু,
নীরবে নিভৃতে শুধু আত্মার বাণী,
শান্ত সমাধিমগ্ন সে-সুর
[illegible] বা থিতানো চির দিবসের
আপনা-বিভোর প্রাণ-পল্বলখানি।

কভু বা সে-সুর উত্তাল তালে,
তাথৈ নাচিয়া চলে,
কিসের উন্মাদনায়!
যেন বা সিন্ধু ঊর্মিপুঞ্জ আছাড়ি' আছাড়ি' পড়ে।

সমর দামামা গর্জিয়া ওঠে স্বার্থের হুঙ্কারে,
নারায়ণী সেনা মৃত্যুর লাগি নারায়ণ সনে যোঝে !
পাঞ্চজন্য শঙ্খে সে-সুর,
অম্বর ভেদি' ওঠে।
সে-সুর তবুও, সেই সুর, সেই সুর !

কখনো সে-সুর চিৎকারি ওঠে,
শোকুনী-কণ্ঠ সম
মর্মন্তুদ ক্ষুধিত আর্তনাদে !
কাহারো অন্ন কুক্কুরে খায়,
ফেলে দেয় অবহেলে ;
কেহ খুঁজে মরে কঙ্কালসার দেহে,
"কোথা হা-অন্ন" বলি'
চক্ষের জলে বক্ষ ভাসায়ে
কাঁদে অন্নের লাগি'।

সুর ঝঙ্কার কি যেন কি গুণ জানে,
যুগের প্রাণের পরশে পরশে
সময়ের গান গায়,—
সেই একই সুর, অবিচ্ছিন্ন সুর।

কেহ বা স্বজন হারায়ে শ্মশানে কাঁদে,
কভুবা বাসরে ওঠে প্রেম সঙ্গীত।
সেই সুর, সেই সুর।

আজিকার চাঁদে নাই কোন মোহ,
না আছে কুসুমে প্রীতি,
ক্ষুধিত মিছিলে আজি সমারোহ,
শ্মশান বন্ধু যেন,
ঐক্যের তানে সুর মিলাইয়া বলে,
'বলো হরি হরি বোল'!
সে-সুরও আমারি অন্তর হতে
যুগের ধর্মে ওঠে।

অনাদি কালের আমি,
আমার পড়িছে মনে,—
ইলোরার ছবি আমি এঁকেছিনু,
অজন্তা আমারই দান,
পিড়ামিড আর ও-তাজমহল,
ওও-তো আমারি গান!

আজিকার দিনে শহীদের বেদী,
ভুখা মিছিলের দল,
অনাদি কালের অতীত হইতে
আঁধার বর্তমান,
আমার সুরের ধ্বনিতে ধ্বনিতে,
সেই সুর, সেই সুর!

তোমরা জানোনা কেউ,

সাক্ষী বন্ধু আছে মোর সাথে সাথে,
যুগে যুগে যারা দেখে আর শুধু শোনে,—
আকাশের তারা,
রবি শশী আর মাটি,
সাগরের জল, বায়ুর প্রবাহ, আলো,
নিশীথ রাতের গভীর অন্ধকার,
মনে মনে তারা বলে,—
জনমে জনমে তুমি,
যুগ-জীবনের তালে তালে গেয়ে চলো,
সেই সুর—সেই সুর।

সূর্যস্নান

শীতের প্রভাত-সূর্য
পূর্ব-দক্ষিণের দিগন্তে জ্যোতিষ্মান।
প্রাণের প্রাচুর্য আকাশে, বাতাসে,
আর দেবদারু—ইউক্যালিপ্‌টাসের মাথায়।
তারা সূর্যস্নানে আত্মভোলা।

হিমাচ্ছন্ন পৃথিবীর
এক নিভৃত কুটীর গুহায়,
শীতাতুর দেহ কুণ্ডলী পাকায়।
বুকে তার কিসের বেদন-শিহরণ।
তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে কম্পনের অনুভূতি।
দুঃখের এক অভিব্যক্তি।

বিস্তীর্ণ মরণজয়ী তৃণে ভরা মাঠ—
সেও দীঘল রাত্রি ছিল হিমকাতর।
সহসা পেয়েছে সূর্যের স্বাদ
প্রাণের স্পর্শে তপ্ত হয়ে উঠেছে
তার তনুশ্রী।
তার দেহের উত্তাপলব্ধ
নীহার কণা,

বেদনার প্রতীক অশ্রুরূপ ত্যাগ কোরে
পেয়েছে মুক্তার শোভা।

সূর্য আহ্বান করছে সবাইকে,—
তৃণের অন্তস্তলে,
দীর্ঘ মীনারের মাথায়,
কিম্বা,
ঐ নিভৃত কুটির গুহায়,
যেখানে,
শীতাতুর দেহ কুণ্ডলী পাকায়!

ধীরে ধীরে সাড়া দেয়!
হিমানী-কাতর কম্পিত কলেবরে পায়,
উষ্ণ আনন্দের পরশ!
তারা বেরিয়ে আসে
সূর্যের উৎসবে!

সূর্যস্নানে মত্ত পৃথিবীতে,
নীরবে ধ্বনিত হয়,
—দুঃখ আছে,
তবু সে নয় চিরন্তনের,
তার পশ্চাতে আছে,
আনন্দের উত্তাপ!—

মূর্চ্ছাতুর পৃথিবীর সম্বিৎ ফিরে আসে,
সেখানে হাসে,
জাগ্রত জীবনের প্রাণধর্ম !
তাই আজ,
ইউক্যালিপটাস্ আর
দেবদারুর তলায়,
তৃণে ভরা মাঠে, আর,
উত্তুঙ্গ মীনারের চূড়ায়,
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে,
গত রজনীর হিমায়িত দেহ,
অবগাহন-স্নানে মেতে ওঠে,
সূর্যের মহা-পারাবারে।

কৃষক পূজারী

গ্রামের প্রান্তর মাঠে ধূলি উড়ে যায়।
দীর্ঘদিন,
বারিহীন দেশ আছে যেন মরুভূমি!
পল্লী–শ্যামল–তীর্থে কৃষক-পূজারী,
বহুদিন করেনি অর্চনা,
লাঙল কোদালি আদি, লয়ে তার পূজার প্রাঞ্জলি।
অনন্ত মাঠের বুকে মাতৃরূপখানি,
রৌদ্রে ফাটা তৃণহীন শ্রীহান কত বা
নেহারিয়া সে কৃষক ফেলিয়াছে শুধু দীর্ঘশ্বাস।

আজিকে চৈত্রের এই পঞ্চদশ দিনে,
সহসা চঞ্চলি উঠে' প্রকৃতির আঁখি,
চাহিল পল্লীর ঐ ধূধূ-তীর্থখানি।
অমনি উড়িল তার তীব্র ধূলিভরা ঝঞ্ঝার অঞ্চল।
নয়নে লাগিল তার কজ্জল অঞ্জন।
গগনের প্রান্তে প্রান্তে পরিপূর্ণ হয়ে গেল মেঘের সম্ভার।
দৃষ্টিতে অশনি গেল খেলি'।
কণ্ঠে তার ওঠে বজ্র ঘোষ।
অশ্রু হয়ে নেমে এল অজস্র বর্ষণ।

দিকে দিকে,
ঝঞ্ঝাসাথে মেঘের গর্জনে বৃষ্টিবুকে,
নেচে চলে প্রকৃতি আর
ও-কালভৈরব।
প্রকৃতি পুরুষ আজি মহাসৃষ্টি করিতে প্রকাশ,
পল্লীর অনন্ত ওই মহাতীর্থে আসি',
খেলিল রঙ্গ।

সচকিত নেত্রে আর বিহ্বল হৃদয়ে,
চেয়ে রয় মুগ্ধ হয়ে,
নব পূজার্থীর বেশে কৃষক পূজারী।
বিদ্যুতের কঠোর বিকাশ,
শ্রবণ পটাহ ভেদকারী গভীর গর্জন,
বৃষ্টিধারা শীলার নিক্ষেপ,—
তুচ্ছ করি সর্ববাধা লয়ে চলে,
কর্ষণ-যন্ত্রিকা তার পূজা-উপচার।
পঞ্জিকা খুলিয়া তার দেখিতে না হয়,
লগ্ন-ক্ষণ-শুভদিন কাল-বৈশাখের।

নববর্ষ

আজ বর্ষ আরম্ভ!
নিদ্রাভঙ্গের প্রথম উন্মিলিত আঁখি-পাতে,
জানিয়ে গিয়েছে,
প্রভাতী সূর্য তাব অভিবাদন।
প্রথম আলোকে নয়নমণি উদ্ভাসিত হয়েছে,
অন্তরে জেগেছে সৃষ্টির দ্যোতনা ;—
যেন নূতন কোরে,
নূতন দিনের নূতন আলোয়,
আমার হলো নব জন্ম!

অতীতের অনন্ত দিনগুলি,
তার,
সুখ দুঃখ আনন্দ আর নিরানন্দ নিয়ে,
মহাকালের যবনিকার পিছনে,
আত্মগোপন কোরলো
চিরদিনের মত।
তাদের কথা ভাবতে চাইলো মন,
অন্তর কোরলো বিদ্রোহ।
অন্তরের জাগ্রত দেবতা,

উদাত্ত সঙ্গীতে গেয়ে উঠ্‌লো—
"এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌,
আজকের যারা নব জীবনের প্রতীক,
আজকের যারা হাসিকান্নার প্রতীক,
তাদের নিয়ে এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌ !"

নববর্ষের প্রথম দিনটি
কোন্‌ রঙের কোন্‌ ছবি,
কোন্‌ সুরের কোন্‌ গান,
কোন্‌ গন্ধের কোন্‌ ফুল
নিয়ে এসেছে আমার হৃদয় দুয়ারে,
তা দেখে নেবার প্রয়োজন আমি বুঝিনি।
আমি বুঝেছি, আমি অনুভব করেছি,
সে চির নবীন,
তার পূর্ণ দিনগুলি অনাগত।
সে আশার নূপুর চরণে বাজিয়ে,
কঙ্কণ-ঝঙ্কারের করতালিতে,
এগিয়ে যাওয়ার ছন্দে গানে,
আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায়।
আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে,
শুধু চেয়ে দেখিনে—
এগিয়ে যেতে চাই তার—
তার পদধ্বনির তালে তালে।

তাতে সাম্‌নে পাবো,
আনন্দ, সুখ, শান্তি কিম্বা,
নিরানন্দ দুঃখ আর
অসীম অশান্তির কাজলিত বিভীষিকা।
সইব,—
আমি নব-প্রাণের গভীরতায়,
সইব সেই সুখ দুঃখের আহ্বান।
সত্য হ'য়ে উঠবে
আজকের দিনের প্রথম সূর্যের
অভিনন্দন।

আজ আমি অনুভব করছি,
সমস্ত সংসার, সমস্ত জগৎ
আমায় তার অন্তর দিয়ে ডাক্‌ছে,
"এগিয়ে আয়। এগিয়ে আয়।
চাঁদের স্নিগ্ধ জোছনায় এগিয়ে আয়,
সূর্যের তীব্র প্রখরতায় এগিয়ে আয়,
মলয়ানিলের স্নেহস্পর্শে,
প্রাবৃটের প্রলয় ঝঞ্ঝায়,
বর্ষার ক্রন্দনে এগিয়ে আয়।
এগিয়ে আয় প্রীতি, প্রেম, ভালবাসায়,
এগিয়ে আয় হিংসা, দ্বেষ
আর কুটিলতার চরম আঘাতে!

এগিয়ে আয় বিশ্বের মিলনে,
আর বিরহ বিচ্ছেদে।
সব রসে, সব সুরে, সব গানে এগিয়ে আয়।”

তাই,
উচ্চ বৃক্ষশাখার অন্তরাল হ'তে,
পাখীর কূজন—
কিম্বা ছোট্ট ছটি চামেলী হেনার
মধুর গন্ধ—
ওদের সাথেও খুঁজে পাই আমার সম্বন্ধ!
আমার আমিত্বকে
সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে,
ওদের সাথে একাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে,
বুঝতে পারি,
অতি স্পষ্ট অনুভব করি,
এই জগতের আলো বাতাস,
এই ধরণীর ধূলিকণা,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই,
আমায় অবিরাম টেনে চলেছে,
অগ্রগতির অসীম অনন্ত সরণিতে!

আজকের নববর্ষের প্রথম বাসরে,
সেই আকর্ষণ, সেই আহ্বান

নূতন সুরে, নূতন গানে, নূতন প্রাণে,
নবীনতম হ'য়ে
আমায় জানিয়ে গেল তার আহ্বান!
সে আহ্বান আমি,
অন্তরের অন্তস্তলে গ্রহণ করি।

হে প্রথম সূর্য!
তোমায় প্রণাম করি।
তুমি আমায় দিয়ে গেলে,
ধরণীর বিস্মরণীর সরণিতে,
এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়—
এগিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ!

আর, হে নববর্ষ!
তুমি তীব্র জ্বালাময় মাধ্যিক সাহারা,
কিম্বা সুখ-স্বপ্নের ভূস্বর্গ কাশ্মীর।
তোমায়,
বিচার আমি করবো না!
তোমার আহ্বান আমি শুনেছি,
তোমার যৌবনের উদ্দামতায়
মুগ্ধ আমি।
তুমি আমায় দিয়েছ,
অস্ফুট নয়—

সুস্পষ্ট অনুভবের চূড়ান্ত নবজন্ম—
একান্ত-বোধের অনন্ত বিরাট,
সত্যসুন্দর নবজন্ম।
তাই তোমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে,
এগিয়ে যেতে চাই।
তাই গ্রহণ কর
হে নববর্ষ!
সমস্ত বিশ্বের একত্ব-বোধে,
পূর্ণাঙ্গ আমার—
আমার সর্বাঙ্গীন দৃঢ় আলিঙ্গন।

ইতিহাস

অতীতের ইতিহাসকে নিয়ে,
ভাবতে বসি একাকী নির্জনে।
তাতে লেখা আছে,
সে-দিনের সংসারের ছবি।
যে-দিন আমার সামনে নেই,
যে-দিন ফেলে এসেছি পিছনে,
অথবা জন্মাইনি যে-ই যুগে,
সে-যুগের গৌরবের কথা,
অগৌরবের কাহিনী।

ঐতিহাসিক তার জীবন ভ'রে,
লিপিবদ্ধ করেছে যুগে যুগে,
যুগোত্তরের সীমানায় পৌঁছে দিতে,
সেই ইতিহাসের সত্য—
বাস্তবতার ধর্ম।
বর্তমানকে স্পর্শ করি
আমার চেতনায়,
স্বপ্নকেও অনুভব করি,
নিদ্রিত অন্তরের অবচেতন কোষে।

কিন্তু ইতিহাস,
সে কেবল
নীরব অতীতের মূক অভিনয় ক'রে চলে,
আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে।
তবু তাকে শ্রদ্ধা করি,
সে-দিনের সত্যকে স্বীকার ক'রে
আনন্দ পাই, দুঃখ পাই।

সংসার প্রবাহের ধারা বুঝতে চাই,
তার গতিপথকে লক্ষ ক'রে।
তার ধারাবাহিকতার তরঙ্গগুলিকে,
মিলিয়ে দেখতে চাই
বর্তমানের কাল-স্রোতের গতি।
আরও দূরে দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করি,
যদিবা পারি,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে,
অতীতের আলোক-পাতে,
সম্মুখ-পথের অন্ধকার নাশ করতে।
তবু মনে জাগে,
মৃত অতীত, অতীতের ইতিহাস,
তাকে নিয়ে চল্‌বে না পথ-চলা।
যাকে সাথে নিয়ে চলা যায় না,
তার স্মৃতিও অক্ষম, সার্থকতাহীন,

অগ্রগতির পথে
এগিয়ে যাওয়ার উদ্দামতায়,
পিছিয়েপড়া-অতীতের স্থান নেই।

ধর্ম হ'তে পারে,
তবু সে কুক্কুর।
কুক্কুরকে নিয়ে চলেছে যুধিষ্ঠির
স্বর্গের পথে,
সাথে আছে চতুর্ভ্রাতা
আর আছে দ্রৌপদী।
পেছিয়ে যখন তারা পড়লো,
মৃত্যুকে বরণ ক'রে একে একে —
ফিরে তো দেখলোনা যুধিষ্ঠির,
মৃত ভ্রাতাদের আর তার প্রিয়তমাকে!
যে গেল সাথে সাথে পা ফেলে,
হোক সে কুক্কুর,
তাকে নিয়েই এগিয়ে গেল সে
সিদ্ধির পথে—আলোকের পথে।
দেখলো না তার,
অতীতের আত্মীয়!

জীবন যাত্রার এ গতিকে
অস্বীকার করিনে।

কর্মময় জীবনের ক্ষণিক অবসরে,
অতীতের ইতিহাস
হয় তো দিতে পারে,
ভবিষ্যতের আলোক-ইঙ্গিত।
তবু তার দিকেই চেয়ে থাকা,
মৃত্যুকে বরণ করার প্রবণতা।

ইতিহাসের আলেখ্য
টাঙানো থাক দেওয়ালে,
ইতিহাসের কাহিনী,
পুস্তকে থাক লিপিবদ্ধ,
অবসর মত তাকে দেখবো,
পুরাণো পৃথিবীর সন্ধান পাবো,
আনন্দে আর দুঃখে
হর্ষে আর বিষাদে।

তবু তুচ্ছ ক'রে এই ইতিহাস,
এগিয়ে যাব,
ব্যক্তিগত ব্যষ্টিগত প্রাণধর্মকে
জাগ্রত ক'রে—উদ্বুদ্ধ ক'রে।

অটল বিশ্বাস স্থির হ'য়ে থাকবে মনে,
যে-দিন গিয়েছে,

সে-দিন আজকে নেই।
আজকের আলো,
সেদিনের আলোককে ম্লান ক'রে,
উজ্জ্বলতর হয়েছে,
উজ্জ্বলতম হ'য়ে এগিয়ে যাচ্ছে
ভবিষ্যতের পথে।
সেখানকার ইতিহাস
আজও রচিত হয়নি।
যেদিন সে ইতিহাস রচিত হবে
সে-দিন
আরও উজ্জ্বল দিনের,
পিছনে পড়ে থাকবে,
তার ইতিহাসের দিনগুলি।

অনুভূতি

আমি এসেছি আর এসেছ তোমরা,
আজকের ধরণীর ফুটিয়েছ তোমরা রূপ,
সে রূপের তরঙ্গে বাজিয়ে চলেছ
সাতটি সুরের বাঁশী,
ঝঙ্কার তুলেছ,
কোটি কোটি সুরের ঐক্যতান!
সাতটি রঙ্গের তরঙ্গে তরঙ্গে
অনন্ত রূপের তুলেছ তোমরা ঢেউ,
রসের মাধুরীতে সরস করেছ আপনাদের।
আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখি
ঐ রূপ!
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শুনি
ঐ সুর!
আকণ্ঠ পান করি
ঐ রসের প্রস্রবণ!

অণুপরমাণুর বিচ্ছেদ সংযোগের
পরম সংঘাতে তোমরা ফুটেছ।
হয়েছ প্রকাশিত আপন সত্বায়,

সৃষ্টি করেছ এই পৃথিবী।
আমিও তোমাদের একজন।
তোমাদের রচিত,
এই মহা-সুন্দরের অংশ হ'য়ে,
ধন্য মনে করি আমাকে।

তবু প্রশ্ন ওঠে মনে ;
হে আমার প্রিয় ধরণীময়-তোমরা,
তোমরা কি অনুভব কর,
এই সৃষ্টির মাধুরী ?
হে অনন্ত আকাশ, অনন্ত জলরাশী,
অনন্ত স্থলভাগ,
হে চন্দ্র সূর্য তারকা,
তোমাদের প্রাণে স্পর্শ করে কি
এই সৃষ্টির আনন্দ ?
হে আমার জগতব্যাপ্ত
গণনাতীত প্রাণী,
তোমরা কি চিন্‌তে পেরেছ তোমাদের ?
দেখেছ তোমাদের রূপ ?
শুনেছ তোমাদের গান ?
অনুভব করেছ কি তোমাদের সত্ত্বা,—
তোমাদের সৃষ্টির মোহিনী লীলা ?

সৃষ্টিমঞ্চের অভিনেতা তোমরা,
আত্মভোলা তোমরা,
আপন অস্তিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে,
দান করেছ পৃথিবীর জন্ম।
সেই পৃথিবীরই এক অণুপরমাণু আমি,
আমার মনে কে দিল দোলা?
কে আমায় পরিচয় করিয়ে দিতে চাইল
তোমাদের সঙ্গে?
চিন্তাতীত বিরাটের মধ্যে,
একান্ত যারা আমার সাম্‌নে,
আমার পাশে, আমার দশ দিকে,
ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হ'য়ে ফুটে ‑লো
তাদেব অস্তিত্বেব জ্ঞান,
তাদের বৈচিত্র্য,
কে আমার মর্মের মণিকোঠায়
পৌঁছে দিল?
তাকে আমি প্রণাম করি,—
সেই তো আমার পরম সম্পদ,
সেই তো আমার পরম আত্মীয়,
তাকে আমি চিনেছি,
সে আমার প্রিয়তম অনুভূতি।
আমার সঙ্গে সকলের

পরিচয় করিয়ে দেবার,
সেই তো আমার অন্তরে
সদা জাগ্রত মাধ্যম—
সে আমার চেতন-অনুভূতি !
সে অনুভূতির ললাটে আমি আমার
বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে,
রাজটীকা পরিয়ে দেই।
জ্ঞানের রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে,
প্রীতি দিয়ে আলিঙ্গন করি।

কর্মব্যস্ত দিনগুলি

যৌবনের উচ্ছ্বসিত চঞ্চলতা ভরা,
প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে গড়া,
ওগো ে‍র কর্মব্যস্ত দীপ্ত দিনগুলি,
তোমরা এনেছ জানি নব জাগরণ,
তোমরা করেছ সৃষ্টি,
জগতের সুন্দর যা-কিছু।

যে আসে সম্মুখে, তাে
স্বাগত জানাই,
দিয়ে যাই তাহারেই আমার প্রাণের বীজ
স্তবকে স্তবকে।
অঙ্কুরিত হয় যাতে
নব নব সুন্দরের জীবন্ত জগত।

রেখে যাই,
কর্মব্যস্ত জীবনের প্রাণের স্পন্দন,
সহস্র পথিক যারা পশ্চাতে আসিছে,
প্রাণবন্ত করিতে তাদের।

স্তিমিত হইবে যবে সর্ব কর্ম-রবি
আমার যাত্রার কোন পশ্চিম অচলে,
তখনও সহাস্তে রবে,
আমার ফেলিয়া যাওয়া,
চঞ্চলতা ভরা,
উচ্ছলিত যৌবনের কর্ম-বীজ হতে
কোন যুগে জন্ম পাওয়া,
পুষ্পপত্রে ভরা কত
মহা মহীরুহ।
তারাই বাস্তবধর্মী যুগান্তের গান,
কর্মব্যস্ত জীবনের পরম সম্মান।

নিস্তরঙ্গ

নিস্তরঙ্গ জীবন–সায়র !
দর্পণের মত তার স্বচ্ছ বক্ষে পড়িতেছে,
কূলের খর্জুর, তাল,
মন্দিরের দীর্ঘ প্রতিচ্ছবি,
গগনের চলন্তিকা শুভ্র মেঘমালা,
যাহারা রয়েছে ঊর্ধ্বে পার্শ্বে চারিদিকে।
হয় তো সে স্থির বারি
পঙ্কিল কলুষ আর বিষাক্ত অপেয়।
হয় তো গরলে ভরা অমিয়–দর্শন
সে-জীবন তরঙ্গ বিহীন,
গাহে না সে জয়যাত্রা গীতি।
ছুটে চলা, বেগে ধাওয়া,
অনন্ত গতির প্রতি নাই কোন প্রীতি।
সে সায়র,
আলেখ্যে ধরিয়া রাখে মৃত্যু–স্তব্ধতায়।

* * *

ঝর ঝর ঝরণার শত স্রোত বেগ,
তটিনীর নৃত্যের চঞ্চলিত ধারা,

জীবন-প্রবাহ দেয়
ছুটাইয়া জগতের বুকে।
সে মহাতরঙ্গ-প্রাণ—
তার বুকে আলেখ্য ফোটেনা
পার্শ্বে যারা রহে দাঁড়াইয়া।
চঞ্চল গতির মাঝে,
কত দেশ করিয়া উর্বর,
আনে নব প্রাণের সন্ধান,
সেথা নাই স্তব্ধ মৃত্যু,
নিস্তরঙ্গ প্রতিবিম্ব ছায়ার সম্পদ।

চলে যায় দূরে

ছন্দে বাঁধা একখানি গান,
ধীরে ধীরে দূরে যায় চলি।

যাহারা দাঁড়ায়ে আছে স্থিতির সীমায়,
দীর্ঘদিন ধরি
ছন্দে বাঁধা গানখানি,
তাহাদেরই মাঝে,
বাজিয়া চলিয়াছিল
আনন্দের মধু পরিবেশে।
দূরে যায় সুর,
এখনো শ্রবণে পশে,
ক্রম ক্ষীয়মান ওর সুমধুর রেশ।
চঞ্চল করিয়া তোলে হিয়া,
হেথা তাহাদের—
সন্দেহ-বিহীন চিত্ত স্থির জানিয়াছে,
তারা আর শুনিবে না,
ক্রমশ মিলায়ে যাবে,
দূরগতা ধ্বনি
অনন্তের শ্রুতি-নীলিমায়।

* * *

জীবনের নদীস্রোতে একটি তরণী,
তরঙ্গের তালে তালে চলে যায় দূরে।

প্রতিটি তরণী পাশে,
ওই তরীখানি,
নদীতটে ছিল বাঁধা
দীর্ঘদিন ধরি।
পাশাপাশি অঙ্গে অঙ্গ দিয়া,
লভেছিল সঙ্গ-প্রীতি কত!
সংসারের নদীতীরে কত কে যে আসি',
পরশ করিয়া গেছে ইহাদের কায়া
কত হাসি, কত সুখ,
এক সাথে লভি'
অব্যক্ত বা ব্যক্ত বাণী,
এ উহারে জানায়েছে নিত্য নিরন্তর!
গোষ্ঠীর প্রাণদ ছন্দে বদ্ধ যেন তারা,
ব্যষ্টিগত মূরতি একক!
সহসা খুলিয়া যায় তরীর বন্ধন
ছুটে যায় স্রোত বাহি',
দূরে বহু দূরে!
নির্বাক বিস্ময়ে চাহে নদীর কিনারা,
চেয়ে রয় অন্য তরীগুলি,

বিরহ বেদনা লভে অন্তরের পটে,
সঙ্গীহীন তারা।

*　　　　　*　　　　　*

পান্থশালা হ'তে যাত্রী
পাড়ি দেয় দূর যাত্রাপথে।

প্রবাসের পান্থশালা।
যাত্রী এসে জোটে,
হেথা হ'তে, হোথা হ'তে,—
ধীরে হয় পরিচয়!
ক্রমে বাঁধে প্রীতির বন্ধন।
গায় তারা সুখে দুঃখে অন্তরের সাড়া!
মেনে লয় সবা মাঝে অস্তিত্ব আপন,
বেঁধে দেয় মিলনের রাখী।
দিন কেটে যায়,
রাত্রি যায় কেটে,
পুনরায় আসে দিন,—
সহসা খুলিয়া যায় দ্বার,
যাত্রী একজন
সচকিত করি অন্যে পথে পড়ে নামি'।
ফিরিয়া না চায়,
যাদেরে আপন বলি' রেখেছিল বুকে,

দিবসে নিশীথে!
তাহাদের দিকে অবসর নাহি চাহিবার।
দৃষ্টি তার সম্মুখের পথে—
চরণ চলিতে থাকে!
যাত্রীরা চাহিয়া দেখে পান্থশালা হ'তে
ক্ষণিকের সাথী চলে যায় সুদূরের পথে।
দীর্ঘশ্বাস বাহিরিয়া আসে,
সবাকার নির্নিমেষ আঁখি চেয়ে থাকে,
দূরে দূরে আরো দূরে,
মিলাইয়া যাওয়া–অঙ্গখানি তার!

* * *

ছন্দে বাঁধা এই গান,
জীবনের এই তরীখানি,
পান্থশালা-যাত্রী এই জন,
আমি, তুমি, সে বা তাহারা,
নিখিল বিশ্বের সর্ব কিছু।
সাকুল্যের মাঝে এই
এককের আসা আর থেকে চলে যাওয়া,
জগতের চিরন্তন এ-নীতির মাঝে
চলিয়াছে যুগে যুগে,
অনিত্যের মহা নিত্য লীলা!

অপ্রয়োজনের প্রয়োজন

সবুজবনে বসেছে আলোর মেলা,
সবুজ পাতার বুকে ফুটেছে অজস্র বনফুল,
নানা রঙে নানা গন্ধে।
তারা তো ছিলনা ফুটে,
তারা তো আসেনি এখানে,
এসেছিল যখন সবাই।
তবু তারা যখন এলো,
তখনও সবাই তো রয়েছে।
তবু তাদের আগমনে
বেড়েছে বন-বালাদের রূপ—
উছলে পড়ছে তাদের
রূপ, রস, গন্ধ, আর প্রাণের আনন্দ!
বনফুলের আলোর মেলা,
জগতের কেউ বা করলো উপভোগ,
কেউ বা দেখলোনা চেয়ে।
এই দেখা না-দেখার মাপকাঠিতে,
মেপে তো সে নেয়নি জন্ম!
সে জন্মেছে নিতান্ত তার জন্মাবার সুখে,
নিতান্ত অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে।

জগৎ চলেছে ওরই ওই একই নীতিতে,
যারা এসেছিল, যারা এসেছে,
আর যারা আসেনি এখনো,
হয়তো, আসবে অথবা,
কোনদিনই আসবেনা।
তাদের এই আসা না-আসা,
নিতান্তই অপ্রয়োজনের প্রয়োজন!

ধরিত্রী চালিয়ে যায় তার রূপ,
এমনি সবাইকে নিয়ে,
যারা আসে আর চলে যায়।
কেন আসে, কেন যায়!
কোন্ প্রয়োজন হয় তার সিদ্ধ!
কিম্বা হয় না!
তাতে কিছু আসে-যায়না পৃথিবীর।

কেউ এলে,
সে তারই হয় অংশ,
কেউ না এলে,
তার কথা তার জন্মায় না মনে।
যে আছে যখন,
সে জগতের অচ্ছেদ্য রূপ নিয়েই আছে,
আর যে চলে যায়,

তার কোন সম্বন্ধই রাখেনা সে আপন অঙ্গে,
স্বপ্নের মত ভুলে যায়,
থাকে না মনে।

তবু তাদেরি নিয়ে,
জগৎ সাজিয়েছে তার,
অতুলনীয় রূপের বাজার।
আপনাকে ফুটিয়েছে আপনার কাছে।
নিজের রূপ সে নিজে দেখে,
আর হাসে,
আয়নায় যেমন দেখে রূপসী
তার যৌবনের সৌন্দর্য সম্ভার, আর,
হাসে মনে মনে!

হায় বনফুল যখন ফোটেনি,
প্রয়োজন তার ছিল না—
ফুটেছে আজ এখন ওই বনে,
তার প্রয়োজনও জন্মেছে সাথে সাথে,
জগৎ-নাটক-রূপকুমারীর প্রধান ভূমিকায়
আজ সে অভিনেত্রী!
আবার যখন চলে' যাবে,
পাপড়ীগুলি মাটিতে এলিয়ে দিয়ে,
নিতান্ত অবহেলায়—

দরকার তার থাকবেনা !
জগতের এই রীতি, এই মহানিয়ম,
চলে আসছে যুগে যুগে,
অবিরাম অবিশ্রাম !

কল্পনার দূত

সুন্দরের করি' উপাসনা,
দিগন্তের দিকে দিকে,
পূর্ণ হ'য়ে আছে হেরি
রূপ রস গন্ধ গান—আলোর সম্পদ !

আহরণ করি মোর ক্ষীণ শক্তি দিয়া,
সে অসীম বৈভবের কণার কণিকা।
যতনে গড়িয়া তুলি,
আমার প্রতিমা,
আমার মানসী কন্যা,—

বিশ্বের আঙিনা হ'তে
কুড়াইয়া শেফালি বকুল,
সাজাই আপন হাতে
কল্যাণী কবিতা মোর
জীবন্ত প্রতিমা।

বিশ্ব-প্রাণ বীজে তারা লভিল জনম,
কল্পনার গর্ভবাস হ'তে ;—
নাম গোত্রহীন নহে
আমার কবিতা,
বিশ্বের অনন্ত নামে তার পরিচয়,
যুগের মানুষ যারা
তাহাদের কাছে।

সৃজনের মায়ামুগ্ধ কবি-প্রাণ-মন
হয় তো প্রতিমা সনে,
খোদিবারে চাহে নিজ নাম।
তবু জানে প্রয়োজনহীন,
নিরর্থক নামের সে মোহ!
যে-আনন্দ-ঘন-রূপ লভিল কবিতা,
আনন্দেই তার পরিণতি।
কালের অনন্ত কোন নীরব গভীরে,
ধুয়ে মুছে যাক নাম,

সে শিল্পীর—সে কবির,
যে করে রচনা,
নিয়ন্তা রচিত এই বিশ্বলোক মাঝে,
প্রতিচ্ছবি সম,
আপন হৃদয়-কল্পলোকে
আপনার পৃথক জগত!

সৃষ্টির আনন্দময় অমৃত আস্বাদি',
সে অমর কবি,
সর্বনামে নামহীন—
পূর্ণত্বের অবিধায়,
প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহে শুধু,—
বেঁচে থাক কালজয়ী কল্পনার দূত,
কবিতা আমার
সমস্ত বিশ্বের প্রাণভরি।
সেই তো পরমানন্দ,
তৃপ্তি সে পরম,
শিল্পী কবি তাহাতেই সার্থকতা গণে!

শহীদ

তাদের জন্যই আমার বিদায় সম্ভাষণ।
আমার এই অভিনন্দন
তাদেরই জীবন-সমাপ্তির স্মৃতি-স্তম্ভে।
তারাই হোক সত্য,
যারা রেখে গেল কালের খাতায়,
তাদের জীবন স্মৃতি,
আত্মাহুতির রক্ত দিয়ে লিখে।

অট্টহাসিতে আকাশ উঠ্‌ছে হেসে,
ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর বুকে
ছড়িয়ে পড়ছে তার ভ্রুকুটি।
সেই অট্টহাসিতে,
আকশ-দৈত্যের ভীষণ কালো করাল মূর্তি,
মুহূর্তে মুহূর্তে বিভীষিকার মত,
চক্ষে উঠ্‌ছে ভেসে,
আর তার ভ্রুকুটিতে,
পৃথিবীর বুকের ছবি
ত্রাসময়ী উন্মাদিনী রমণীর
ত্রস্তা অথচ অট্টহাসির চঞ্চলা চাহনী।

তার সাথে ঝঞ্ঝা।
সে তার চরম উন্মাদনায়,
মত্ত মাতঙ্গের মত,
শান্ত প্রকৃতিকে ক'রে তুলছে উদ্‌ব্যস্ত।
ঝটিকা বিক্ষুব্ধ দিকে দিকে,
তীক্ষ্ণ ফলা তীরের মত,
বেগে নেমে আসছে,
ঐ দৈত্য-মেঘের করপ্রক্ষিপ্ত বারি-ফলাকা।

তমসা রাত্রির অন্ধকারে,
এই ভয়াবহ মৃত্যু-তাণ্ডব
আজ মনে জাগায়,
দুর্দিনের প্রলঙ্করী কল্পান্তর।

এই দুর্দিনকে জয় করতে হবে।
তার যতই দুর্দমনীয় হোক,
প্রচণ্ডতম আঘাত—
সে আঘাতের বুকে
বুক পেতে দাঁড়িয়ে,
পিছনের যারা,
তাদের করতে হবে রক্ষা।
আত্মবলির চরম শক্তি দিয়ে আত্মরক্ষা।
এই তো বাস্তব সত্য।
অনাদি সত্য।

পিছনকে বাঁচাতে,
যারা এই প্রলয়ের ঝঞ্ঝায়
নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে,
এই কল্পান্তরের অন্ত সীমায় এসে
যারা প্রাণের স্পন্দন নিয়ে বেঁচে থাকবে,
আর অনাগত ভবিষ্যতে যারা আস্‌বে,
তাদের অন্তরের ইতিহাস
চিরদিন জানাবে ঐ নিশ্চিহ্নদের
পূত স্মৃতিকে
উচ্ছ্বসিত ভক্তিনম্র প্রাণবন্ত অভিনন্দন!
তাদেরই জয়গান,
হবে,
উদাত্ত ধ্বনির জীবন্ত সম্পদ।

হে অতীত

অন্তহীন অতীত !
তোমার রূপহীন রূপের দিকে
চেয়ে চেয়ে,
বিশ্বনয়ন-পল্লব,
স্তব্ধ বিস্ময়ে মুদিত হ'য়ে যায়।
বিস্মৃতির গুহায় তুমি ঘুমিয়ে আছ,
অনাদি অনন্তকাল !
কিম্বা,
গভীরতম নীরবতার মাঝে,
যেখানে পঁহুছেনা কোন সুর,
পঁহুছেনা কোন আলো,
পঁহুছেনা কোন রূপ,
কোন চিন্তা,
কোন কিছু বর্ত্তমানের প্রাণধর্ম,
বসে আছো সেখানে,
আর নিত্য,
নিমিষে নিমিষে আকর্ষণ করছো,
পৃথিবীর জাগ্রত জীবন !

যারা আজ এখানে এসেছে,
বর্তমান-মুখী ভবিষ্যতের
সম্ভাবনার অনন্ত পথ ভেদ করে,—
যাদের জীবনের জয় পরাজয়ে,
হর্ষে আর বিষাদে,
হাস্যে আর ক্রন্দনে,
মুখরিত হচ্ছে চতুর্দিক,
তাদের কর্মময় প্রাণ-সূর্য
ক্ষণে ক্ষণে,
পরিবর্তনের আবর্তে প'ড়ে
এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি মুহূর্তে,
হে অতীত,
তোমার কৃষ্ণঘন মদির আবেশময়
আলিঙ্গনে ঢুলে' পড়ে!
অতি সমাদরে তাদের নিয়ে চলে যাও,
তোমার কোন
অজানা অতলের অন্তহীন দেশে!

অতীত-মুখী বর্তমানের
পিছনে পিছনে ছোটে স্মৃতি।
অক্ষম ক্ষীণ শক্তিতে,
এই স্মৃতিও
তোমার যাদুকরী বিদ্যায়

ক্রমশ ম্লান হ'য়ে
তন্দ্রায় পড়ে ঢুলে;
শেষে,
ঘুমিয়ে প'ড়ে চির নিদ্রায়,
তোমার রহস্যময়
অরূপ-অঙ্গের অস্তিত্বহীন মহাশূন্যে,
গ্রহণ করে আশ্রয়।

মহা-বিরাট চির নিস্তব্ধ হে অতীত!
ক্রম-বর্ধমান চির সত্য
তোমার এই রূপের দিকে,
তোমার এই অচিন্তনীয়,
অস্তিত্বের দিকে,
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি,
আর ভাবি,—
ভবিষ্যত,
পরিবর্তনশীল তার রূপ নিয়ে,
মুহূর্তে মুহূর্তে এগিয়ে আসে,
বর্তমানের সীমারেখায়,
ক্ষণে ক্ষণে লাভ করে সে,
জন্ম আর মৃত্যুর যুগল অভিনন্দন!

বর্তমান,
সেও নিত্য আকর্ষণ করে,

ভবিষ্যতের অনন্ত স্রোতের ধারা,—
আর নিমিষে নিমিষে,
আপন পরশ দিয়ে,
তাকে মুগ্ধ ক'রে, জাগ্রত ক'রে,
প্রস্ফুটিত ক'রে,
তখনি ত্যাগ করে তোমার,
অদ্ভুত অসীম নীরব মহিমায়,
যেখানে সত্ত্বাহীন হ'য়ে,
চির বিশ্রাম লাভ করে,
তোমার অনন্ত সত্ত্বায় !

জন্মদিন

হে আমার জন্মদিন,
তোমাকে স্মরণ করি।
আজকে তুমি এসেছ
তোমার জন্মান্তরবাদের রহস্য নিয়ে।
আমার জীবনেই তুমি
কতবার এলে,
কতবার তোমার স্নেহের স্পর্শ আমি পেয়েছি।

যখন জ্ঞান হয়নি, তোমায় চিনিনি,
যখন চিনেছি,
তখন ভালবেসেছি জন্মদাতা বলে।
ভেবেছি,
বর্ষ-পরিক্রমায় এই দিনটিকে
তুমি বয়ে আনো,
আমায় এক বছর আগিয়ে দিতে,
বাড়িয়ে দিয়ে জীবনের দীর্ঘতা।

আমার জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে,
মনে হয়েছে,

তুমি তো আমার জীবনকে বাড়িয়ে দিতে আসোনা,—
তার চিহ্নিত শেষ পথ-প্রান্ত
কমিয়ে দিয়ে যাও প্রতিবার।
তাই জগতকে ভালবাসতে গিয়ে,
তোমায় ভালবাসিনি।
মনে হয়েছে,
তুমি আমার বয়স কমিয়ে দিতেই
আসো আমার জীবনে!

আবার জ্ঞানের সীমানা বেড়ে যায়।
ভাবতে থাকি তোমাকে।
আবার তোমায় ভালবাসি।
তুমিই তো এনেছো আমায়,
এই পৃথিবীতে,
অথবা,
তোমার পুণ্যদিনটিতে,
পেয়েছি আমি পৃথিবীর ছোঁয়াচ—
তোমার করুণার তো নেই অন্ত!

মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা?
সে তো, বছরের পর বছর, তুমি দাওনা আগিয়ে,
তাতে তো বছরের প্রয়োজন হয় না।
সে-দিক দিয়ে যখন দেখি,

অবাক হয়ে যাই ;
কেমন ক'রে আমায়—
সেই আমায়—
সেই কত বছর আগের আমায়
আজকের "আমি" বলছি !

সে-আমি তো বেঁচে নেই !
প্রতি মুহূর্তে যে,
আমার নব নব জন্ম,
আর নব নব মৃত্যুর নিত্য পরিবর্তনে
এগিয়ে যাওয়া !
সেখানে তো তুমি নেই জন্মদিন !

তোমার যে-দিনটি
আমায় দিয়েছিল জন্ম,
সে-দিনটি যেমন মরে গিয়েছে অতীতের বুকে,
সে–দিন যে-শিশু পৃথিবী দেখলো,
সেও তো আর নেই !
সেই-তুমিও নেই, সেই-আমিও নেই।

প্রতিক্ষণের বর্তমান-আমিকে ধ্বংস ক'রে,
ভবিষ্যতের আমি
এগিয়ে আসে কালচক্রে,
ধারণ করে বর্তমানের রূপ !

ক্ষণে ক্ষণে বর্তমান-আমির মৃত্যু হয়,
লাভ করে অতীতের কৃষ্ণাবগুণ্ঠন!
অতীতের-আমির কথা মনে হ'লে,
মনে হয়,
সে তো পূর্বজন্ম এ-জন্মের ;—
আমি জাতিস্মর!

তাই আব একটু জ্ঞানের কপাট খুলে দেখি,
জন্মাবার আগেও ছিলাম আমি,
মৃত্যুর পরেও আমি থাকবো!
হে আমার জন্মদিন,
তুমিও আমার জন্মেব বহু—
বহু যুগ আগেও ছিলে,
আমার চলে যাওয়ার পরেও,
তুমি আস্‌বে এই জন্ম-মৃত্যুর নেমী চক্রে,
প্রতি বর্ষের এই দিনটিতে!
সে-দিন তোমায় আর আমি ভাববো না।

আমায় এনেছ
আমার হাত ধরে,
জীবনের বর্ষ-পরিক্রমায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ!
একদিন তার শেষ হবে,
সে-দিনও তোমার

আসা-যাওয়ার কাজ ফুরাবে না!
আমিও অনন্তকাল পরিবর্তনের তাগিদে,
অন্যরূপে বিরাজ করবো,
তোমার আমার ধরণীতে!
তাই, তুমি আমি চিরদিনের বন্ধু!

তোমার অনন্ত গতিপথে,
আমার অস্তিত্বহীনতার এবং অস্তিত্বসত্ত্বার
নিত্য বিকাশ!
হে জন্মদিন!
আমার জীবন-প্রদীপের
বর্তমান-রূপশিখার কম্পনে কম্পনে,
অথবা ভবিষ্যতের অনাগত দীপান্ধকারে,
তোমার অনন্ত বর্ষচিহ্নরূপ-অস্তিত্বের
পরম মিতালিতে,
চলতে থাকবো দুজনায়।

তাই তোমায় জানাই,
আমার মর্মের অভিনন্দন,
আমার নমস্কার!
মানুষের মাপা এই-বছরের হে জন্মদিন,
নিতান্ত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেই,
তোমায় স্মরণ করি;

নইলে, তুমি আমি অনাদি-অব্যয়, চির অবিস্মরণীয় ;
বয়সের মাপকাটি
তোমারও নয়, আমারও নয় !

চোখ গেল

চোখ গেল। চোখ গেল।
বনানীর গভীর অন্তরে,
দৃষ্টির বাহিরে কোন গোপন হইতে,
সহসা আসিল ভাসি',
করুণ কাতর ধ্বনি রহিয়া রহিয়া,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

কার চক্ষু গেল হায়,
কেবা করে হেন আর্তনাদ।
সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গে হেন,
কে করে আঘাত।

যার তরে,
ব্যথিতের দারুণ ক্রন্দন,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

অন্বেষিতে প্রবেশিনু বনে।
ব্যথাতুর কোন জন অক্ষি বেদনাতে,
বনান্তের স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ে,
বসিয়া নির্জনে একা,
ফুকারিছে মর্মান্তিক কথা,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

বহু ক্লেশে করি নিরীক্ষণ,
ঘন পত্র-আচ্ছাদিত বিটপীর শাখে,
বসিয়া একাকী,
হয়তো বা করি নিমিলিত,
দুটি আঁখি তার,
কাঁদিছে কাতরে কত কিবা যন্ত্রণায়,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

ওরে ও বিহগ, মোরে বল,
কে করিল আঁখিতে আঘাত?
নয়নে কিসের ব্যথা পেলি?
সারাদিন যার তরে,

কাননের এই নিরালায় সুগোপনে বসি',
কাঁদিস একাকী,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

ওরে বিহঙ্গম।
বুঝিয়াছি তোর মর্ম ব্যথা,
আজি যে ধরার বুকে বসন্ত উৎসব।
কুসুমে কুসুমে ঢলাঢলি,
দখিনের গন্ধবহ পুষ্পবাস ল'য়ে,
মুগ্ধ করি' সর্ব হিয়া,
দিয়া যায় আনন্দ পরশ,
মিলনের লাগি।
হায়, ওরে, হে চির বিরহী,
চক্ষে তব বেদনার উত্তপ্ত শলাকা—
সে মিলন ছবি বিদ্ধ হয়;
তাই কাঁদো বিরহ ব্যথায়,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

কোথা কোন পনস শাখায়,
দুটি ঘুঘু দোঁহাকার চঞ্চু চুম্বনিয়া
করিতেছে মিলন-উৎসব।
কেহ বা ফুলায়ে কণ্ঠ,
আবেগ দোলায়,

হুলিয়া ডাকিছে কাছে,
তার প্রিয়তমে।
তোমার সহিবে কেন সে দৃশ্য মধুর।
অমনি চিৎকারি' উঠো গগন বিদারি,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

কোথাও পঞ্চমতানে প্রেমগীতি গায়,
কোকিল কোকিলা পাশে।
কোথাও দোয়েল শ্যামা,
বসন্তের প্রেমাহ্বান শুনি',
প্রেমলীলা করে সাথে স্বীয় বাঞ্ছিতার।
সে আলেখ্য,
হে বিরহী পাখী,
কেমনে সহিবে বলো,
তাই ওঠ ডাকি,—
চোখ গেল। চোখ গেল।

প্রজাপতি উড়াইয়া রামধনু পাখা,
বায়ু ভরে নৃত্য করি সপ্রেম চুম্বনে,
যুথীকার বক্ষ হতে করিতেছে অমিয় গ্রহণ।
কোথাও বা ভ্রমর মক্ষিকা,
চরণের মৃদুঘাতে,
পাপড়ী সরায়ে,

শত পুষ্পে পান করে হৃদয়ের মধু,
পরাগের হোলী লীলা মাঝে !
বিরহী বিহগ,
কেমনে সহিবে তাহা তোমার নয়ন,
তাই জ্বলে হিয়া মন,
আঁখি–জ্বালা তাই—
তাই শুনি নিরজন হতে,
দগ্ধিভূত হৃদয়ের ব্যথা,—
চোখ গেল ! চোখ গেল !

বসন্তের পূর্ণিমা আলোকে,
স্নিগ্ধতায় স্নাত হয়ে,
নরনারী কত মিলিছে রভসে।
দখিনা মলয় আসি,
ক্লান্তি দূর করিছে ব্যজনে।
তুমি হায় দূরে বসি' নিরখি' সে ছবি,
কেমনে সহিবে বলো,
আপনার অন্তরের জ্বালা।
বক্ষ বিদারিণী বাণী,
প্রচারিছ তাই,—
চোখ গেল ! চোখ গেল !

মিলন উৎসব দিনে,

বসন্তের প্রেম-রাজ্যে,
ওরে ও বিহগ,
ওই তোর বিরহী অন্তর,
দরশি' বেদনা পাই—
ভারাক্রান্ত হয় মর্ম মোর।
সান্ত্বনার কিছু নাই।
সর্বজন-মিলন-কল্যাণে
তবু কহি তোরে,
নির্মম কঠোর উপদেশ!
মিলনের পুণ্যক্ষণে
দিসনাকো চমকিত করি'
যাহারা মিলিত চাহে বসন্ত সভায়।
তাহাদের পুলকিত মনে
আনিস না বেদনা মূর্চ্ছনা।
মর্ম্মপীড়া দিসনাকো
জ্বালাময় বিরহ সঙ্গীতে,
চোখ গেল! চোখ গেল!

আমি আর ঘাস

সবুজ ঘাসের গাল্‌চে পাতা আঙ্গিনাতে,
একলা ছিলাম ব'সে,
একলা ? না, তা ঠিক নয়, সঙ্গী আমার ছিল,—
আমি এবং ঐ যে সবুজ ঘাস,
মোদের মাঝে চল্‌তেছিল প্রাণের আলাপন।

মুখ তো ছিল বুঁজে আমার,
আর ওই কচি সবুজ ঘাস.
সেও তো চির নীরব হয়েই থাকে।
তবু আলাপ জমেছিল বেশ,
হয় তো আমি সঙ্গোপনে করেছিলাম প্রশ্ন,—
'তামায় আমায় প্রভেদ কতটুকু ?
বর্ষাকালে লাভ করেছ
উচ্ছ্বসিত যৌবন তোমার,
পুনরায় শীত আসি',
শুষ্ক করি পাঠাবে তোমায় মৃত্যুর দুয়ারে ;
পুনঃ বর্ষকালে জন্ম নিবে ধরা-বক্ষে নবীন সবুজ।
জন্ম-মৃত্যু পৃথিবীর বুকে,
তোমারও যেমন, আমারও তেমনি ওগো ঘাস।

হয় তো সে দিয়েছিল উত্তর,—
ঠিক বলিয়াছ,
তুমি আমি একই মাটী জলে,
একই রৌদ্রে, শূন্যে বা বাতাসে জনম পেয়েছি,
শুকায়েও যাব একদিন,—
হয় তো বা কেহ আগে, কেহ কিছু পরে—
পুনরায় ওই আসা-যাওয়া।
ধরণীর সাথে সাথে ঘোরে সূর্য, ঘোরে চন্দ্র তারা,
আসে যায় বার বার,—
আমরাও তেমনি বারে বারে,
এই ধরণীর মহাঅংশ হ'য়ে,
আসি যাই, ঘুরি নিত্য ;—
বিভিন্ন শুধুই, আমি ঘাস আর তুমি কবি,
অন্তরে তোমার জাগে গান,
জগতে মানুষ তুমি আর আমি ঘাস।

হয়তো বা সসংশয়ে ঘাসে বলে' ফেলি,—
তুমি ঘাস? আর আমি মানুষ?
এ অন্তরে জাগে গান?
তাই বুঝি কবি আমি তোমার নয়নে?
কেন? ভুল কিবা হয়, যদি বলি,
আমি ঘাস, তুমি কবি, তুমিই মানুষ।

অন্তরে জাগে গান মোর ?
কেন,
তোমারও তো জাগে প্রেম,
তুমিও তো গান কর মহাসবুজের।
তুমিও তো বৃদ্ধ হ'লে শুকাইয়া যাও
ধরার অঙ্গন হ'তে, কত কেঁদে হেসে।
আমারি মতন ধরাবুকে মৃত্যু হয়,
কখনও বা হয় নবীন জন্ম তোমার!
আমি আর তুমি, কিছু ভেদ নাই জগতের কাজে,
আসি যাই, পুনঃ আসি, পুনঃ যাই,
যে কদিন থাকি ভালবাসি পৃথিবীকে,
তুমি আর আমি,
এক তালে, এক গানে, একই গতিতে,
নিত্য নাচি, নিত্য গাই, নিত্য ঘুরি,
জগতের মহাঘূর্ণিপাকে!

পৃথিবীর আঙ্গিনাতে তুমি আমি যজ্ঞ করি,
সৃজন-পালন-লয়-যজ্ঞ
দু'জনায় একই আত্মা নিত্য আহুতি দিতেছি!
ভুল নয় প্রিয়তম, যদি বলি,
তুমি কবি, আমি হই ঘাস,
ক্ষতি কিবা?

বুঝি বায়ু গেল কানে কানে কথা কয়ে তার,—
তবু তবু, সর্ব্বদিক ভেবে দেখো শ্বাস।
মাথা নাড়ি' 'তাই ঘাস কহে যেন,—
না না প্রিয়তম, তা কি হয়, তা কি হয়—
তুমি কবি আমি কাঁচা ঘাস।

অধিকারের দাবি

আপন আপন অধিকারের দাবি নিয়ে,
অসন্তুষ্ট মানুষ,
মানুষের সঙ্গে করে' চলে বিবাদ।
সে বিবাদ রূপায়িত হয়
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে,'
দলে দলে,
সমাজে সমাজে—
আর তার চরম পরিণতি হয়
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে।

মনের অসন্তোষ রূপ নেয় বাক্যে,
আর ফুটে ওঠে ভ্রু-ভঙ্গিতে,

চঞ্চল রক্তের উদ্দাম গতিতে,
আর মাংস-পেশীর নর্তনে।

অসন্তোষের দানবতা,
আশ্রয় করে দেহ-মনের অসুর-শক্তিকে ,—
তারপর উদ্ভাবন চলে যন্ত্রের—
হত্যার দারুণ মারণ অস্ত্র—
প্রস্তর, তীর. ধনু,
বন্দুক, কামান, রাইফেল,
আর ট্রাঙ্ক, জেপেলিন, ইউবোট,
তার সাথে আরো কত কি ?
শেষে দেখা দেয় আনবিক বিস্ফোরণ—
এ্যাটম বোম্—
হাইড্রোজেন' আর নাইট্রোজেন'।
ধ্বংস হয় মানুষ,
ধ্বংস হয় গ্রাম, সহর, নগর,
ধ্বংস হয় দেশ।

তবু তার মূলসূত্র ঠিকই রয়ে যায়।
আপনাকে হারিয়ে, দেশকে হারিয়ে,
সব কিছু হারিয়েও,
ঠিকই থেকে যায়,
তার মূলীভূত কারণতত্ত্ব।

সে তত্ত্বের হয় না নিবৃত্তি।
মূলসূত্রটি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চল্‌তে থাকে।
চল্‌তে থাকে আপন পৈশাচিক অট্টহাসিতে—
চল্‌তে থাকে তার দৃঢ় পদবিক্ষেপে।

তাকে মনে রাখা দরকার।
তাকে চিনে রাখা দরকার।
সেই হোলো,
অধিকারের দাবি।
যার সত্তা অনন্তকাল ধরে'
কুয়াসাচ্ছন্ন—
নীহারিকায় ঘেরা।

অগ্রগতি

অগ্রগামী! অগ্রগামী!
চল্‌ছি ছুটে ভবিষ্যতের মাঝে,
এরোপ্লেনের মত,
কিম্বা, কাল বৈশাখের হঠাৎ আসা ঝঞ্ঝা-মেঘের মত,
আমি আজ এগিয়ে যাওয়ার নেশায়
অগ্রগামী!

কোথায় যাব জানি না তা,
কেমন সে পথ,
হয়তো বা বন্ধুর,
নয় তো,—
নয় তো নয়,
ঠিকই সে বন্ধুর,
অজানা সে তো বটেই,
তাই সঙ্গী আমার নেই ;—
নেই ?
নেই বল্‌লে মিথ্যা হবে বলা,
সঙ্গী আছে,
ঐ তরুণীর দল! ঐ তরুণের দল!

যাদের চোখে বিদ্যুতের ঝলক,
প্রাণে প্রলয়ের তাণ্ডবতা,
বৈশ্বানরের উন্মাদনা,—
আর পায়ে,
ছুটে চলার টর্ণেডো,
কেবল ঘূর্ণীবাত্যার মত,
লুর মত,
চলেছে অবিরাম অবিশ্রাম।

সমাজের ষ্ট্যাগ্‌ন্যাণ্ট কর্দমাক্ত জলে,
যারা আনতে চায়,—
যারা গুম্‌রে ওঠা-অন্ধকারের বুকে
ফুটাতে চায়,—
হাঁ, ফুটাতে চায় চন্দ্রাতপ ;
—আর অসম্ভব বোলে,
যারা পিছনকে আঁকড়ে ধরে
চোখ বুঁজে—
তাদের দেখে যারা ওঠে
বিদ্রুপ কোরে উন্মাদনার অট্টহাসিতে,
আমার সঙ্গী তারা,
তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে
ছুটে যাই ওই অন্ধকারের বুকে।—
অন্ধকার ?

না, না, ওখানে আছে আলো,
আজকের দিনের আলো,
ওই আলোর দিকে ছুটছি
আমি অগ্রগামী।

এক হাতে আমার বিজয় ডঙ্কা,
নির্জীবদের উৎসাহ দিয়ে,
সজীব করতে
কিম্বা বিদ্রুপ করতে, আর,
অন্য হাতে,
অন্ধকারের বক্ষভেদী
সুদূর প্রসারি ব্যাটারিপূর্ণ এই টর্চ!
পিছনে অন্ধকার ফেলে,
অগ্রসর হব আমি
এরি দেওয়া আলোকে আলোকে।
সেই আলোয়,
চল্‌ছি ছুটে ভবিষ্যতের মাঝে,
এরোপ্লেনের মত
ঝঞ্ঝার মত—বিদ্যুতের মত—
সেকেণ্ডে আটবার
পৃথিবী বেষ্টনকারী রেডিওর মত—
অগ্রগামী, আমি অগ্রগামী।

বিশ্বভাষা

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ,
যারা আজ,
পূর্ণ যৌবন নিয়ে উৎসবে মত্ত—
জীবন উৎসবে,—
সে-উৎসব তাদের চলেছে অনন্ত ধারায়।

অনার্য বনবাসী আর
পিগ্‌মী, এস্কিমো,
কিম্বা মরুবাসীদের উৎসব,—
যাদের জন্মায়নি প্রাণের সূক্ষ্মানুভূতি ;
আর, আর্য বলে যারা গৌরবান্বিত
সৌধ অট্টালিকাবাসী,
যারা জ্ঞানের পীড়ামিড গড়ে তোলে,—
তাদের উৎসব—জীবন-উৎসব,
লক্ষ লক্ষ রূপে রূপায়িত,
অন্তহীন তার ধারা।

এই অনন্ত জাতির
অনন্ত জীবন-উৎসবের

কোনটী পঁহুছেনি শেষের সীমায়।
তা, সে,
জীবনানন্দের উত্তুঙ্গ শিখরে হোক,
কিম্বা,
ব্যর্থ যৌবন-সংঘাতে তলিয়ে যাওয়া—ক্রন্দনের
অতল পরশে।

তবু জানি,
চলে তাদের জীবন
গানে আর ক্রন্দনে।
সে-সঙ্গীতের ভাষা এক নয়,
তার সুর বিভিন্ন,
সে-ক্রন্দনও বিশ্বের নানা ভাষায়
নানা সুরে হয় ধ্বনিত।

তবু জানি,
হোক ভিন্ন তার সুর,
হোক ভিন্ন তার প্রকাশ ভঙ্গি আর ভাষা;
অন্তরের গূঢ়তম দেশে
সে-গান, সে-ক্রন্দন,
সর্বদেশে সর্বকালে
একই প্রবাহে প্রবাহিত।

সে-ক্রন্দনের প্রবাহ,
সে-আনন্দ গানের স্রোত,
সকল প্রকাশ ভঙ্গিকে
সকল ভাষাকে
এক পাশে ঠেলে রেখে,
আমার অন্তরের প্রবাহে মিশে যায়।
আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে
আর ব্যথিত অন্তরে শুনতে পাই,
অসম্পূর্ণ তাদের প্রকাশ ব্যঞ্জনা,
খঞ্জ তাদের গতিধারা।
আনন্দের গানে সমগ্র বিশ্বে
ওঠে না তার স্পন্দন।
ক্রন্দনের মর্ম বেদনায়
মূর্ছিত হয় না নিখিল সংসার!

পৃথিবীর কোনো ভাষা
এখানে সার্থক হ'য়ে ওঠেনি।
ক্রন্দন কোথাও পূর্ণ ক্রন্দনে কাঁদেনি!
আনন্দের গান,
কোথাও পূর্ণত্বের আলোয় হাসেনি।
সেই পূর্ণত্ব খুঁজে বেড়াই,
আমার অন্তরে—আমার হৃদয়ে।

তবু,
তখনি আসে উন্মাদের হাসি
আমার ঠোঁটে,
আমার চোখে,
আমার সর্বাঙ্গে।
পূর্ণত্ব খুঁজে বেড়াই!

পূর্ণত্বের সন্ধান পেলেও
তাকে,
বিশ্বের সর্বজনের অন্তরে
ছড়িয়ে দিতাম কোন ভাষায়?
কোন ভাষায় তারা
করতো তাকে হৃদয়ঙ্গম?

তখনি চিৎকার করে মন
—এক ভাষায় সমস্ত পৃথিবী, কেঁদে উঠুক,
গেয়ে উঠুক,
চালিয়ে যাক্ তাদের যৌবনের
কান্নাহাসির উৎসব!
হোক সে-উৎসব অসম্পূর্ণ!
অপূর্ণ উৎসবকে,
সেই বিশ্ব-ভাষা,

পূর্ণ করে দেবে—
এ আমার স্বপ্ন!
আশাবাদীর বাস্তব কল্পনা!

সমস্যা পুরুভুজ

বেঁচে থাকার সমস্যা নিয়ে
জগত চলেছে।
এই সমস্যাকে সামনে রেখে,
যে পারে এর সমাধান করতে,
একে ধ্বংস করতে,
সেই বেঁচে থাকার গৌরবের
হয় অধিকারী।

সমস্যার তবু নেই মৃত্যু।
একের মৃত্যুতে নূতনের জন্ম!
সমস্যার কণ্ঠ রোধ ক'রে
তাকে মেরে ফেলবার যে আনন্দ,
সে-আনন্দ পেতে পেতেই
গজিয়ে ওঠে নূতন নূতন সমস্যা!

পুরুভুজ !
ঠিক যেন পুরুভুজ !
মৃত্যুদণ্ডে খণ্ডিত দেহে হ'তে
নূতন প্রাণ লাভ করে'
শত পুরুভুজের হয় আবির্ভাব !
এই সমস্যা-পুরুভুজের সঙ্গে,
চলে যে-মহাসংগ্রাম
তাতেই মগ্ন থাকে—
মত্ত থাকে জীবন,
রক্তাক্ত হয় যাত্রাপথ !

তবু এই ধারাবাহিক
চিরন্তন গজিয়ে ওঠা সমস্যাকে
পৌনঃপুনিক জয় করে যাওয়াই জীবন !
আর
পরাজয়ই হয় মৃত্যু !

শাশ্বতিক

না-পাওয়াই এখানে পাওয়ার শাশ্বত নামান্তর !
চাওয়ার আছে চেতনা,
কিন্তু সেই সচেতন চাওয়ার সত্বা,
চাওয়াতেই থাকে আত্মকেন্দ্রিক।
তাই তো ওঠেনা পাওয়ার কোন প্রশ্ন।
চাওয়ার আনন্দময় পূজারী,
চাওয়া-পাওয়ার সংঘাত থেকে থাকে মুক্ত !

অনন্ত নীলিমার ওই নিঃসীম মাধুর্য
চিরদিন দেয় হাতছানি,
ডাকে তার স্বপ্ন কুহেলীর অসীমকে।
ডাকা আর ডাকা।
চেয়ে দেখা আর চেয়ে দেখা !
কেউ তো পৌঁছায় না,
তার সেই অন্তহীন মরীচি-সীমায় !

তবু চেয়ে থাকার আনন্দে
ওই সুদূর নীহারিকার স্বাপ্নিক আহ্বানে,
চেয়ে থাকে সবাই।

চেয়ে থাকে,
জীবনের সমস্ত আকুতি আর,
ভালবাসা দিয়ে।

পাওয়ার নেই কোন আশা,
তবু চাওয়ার আছে চেতনা,
সে চেতনার জয় হোক।
শূন্যময় পূর্ণত্বের অবিধা তার হোক সার্থক!

তমসা

স্তব্ধ নিশীথ রাতে,
বহে স্রোত গলিত তমসা,
অনন্তের পথে,
কার দৃষ্টি নেহারিবে তাহা!
নিশীথিনী মায়াবিনী কি যাদু মায়ায়,
সবাকার দৃষ্টি হায় দেছে আবরিয়া।
নিকটে নাহিক আলো,
দূরে অন্ধকার,

অনন্ত বিস্ময় একি!
ছায়াহীন কায়া
জগতেরে আছে ঢাকি',
আপনার সুকৃষ্ণ অঞ্চলে!

রূপে রঙ্গে রঙ্গময় ধরণী রূপসী,
অঙ্গে অঙ্গে বিচ্ছুরিয়া রূপের গরিমা,
কত যুগ হ'তে তার,
সাজায়েছে সৌন্দর্য সম্ভার।
সাগরের তটদেশে,
প্রবাল মাণিক্য আদি হ'তে,
ধরিত্রীর বক্ষে ফুটি শ্যামল মহিমা,
তার মাঝে অগণিত অক্ষি তৃপ্তিকর,
কুসুম রঙ্গিন কত,
কত জীব,
কতনা পর্বত নদী বনানী অম্বর,
বালুময় মরু উপবন,
বক্ষে তার করি সুসজ্জিত
রূপসীর বেশে সদা সুবিন্যস্ত ধরা,
হাসিয়া আপনি পড়ে আপনায় লুটে;
প্রভাতের আলো নিত্য
তাহারে বাসিয়া ভালো কতনা ফুটায়।

সপ্তঅশ্বে ছুটে আসি',
দিনমণি আপনার বক্ষের সঞ্চিত
অফুরন্ত রঙ্গ দেয় ঢালি,
রূপময়ী ধরিত্রীর,
শিরে শিরে—
অঙ্গে অঙ্গে
সস্নেহে মাখায়ে।

এবে হায় কোথা আলো,
কোথা দিনমণি,
কোথায় কিরণ তায় সপ্তরঙ্গে ঘোর—
ফুটায়না রূপসী নয়ন
তমিস্রা নিশীথ আসি',
গ্রাসিল সহাস্যময় আলোকের খেলা,
সাথে সাথে গ্রাসিয়া রূপের সজ্জা,
অরূপা করিয়া দিল মহী রূপসীরে।

রূপ নাই, রঙ্গ নাই, আছে শুধু কালো,
উন্মীলিত নিমীলিত একই গুণ ধরি'
দৃষ্টি হায় অন্ধ সম চলে।
আনন্দ বিদায় নিয়া,
ঢেলে দেয় নিরানন্দ ভীতি।
ক্ষণে ক্ষণে,

মর্মে শুধু জাগে,
কেহ বুঝি নাই পৃথিবীতে,
একা, শুধু আছি একা,
আপনায় আপনি আঁকড়ি।

সারাটি জগৎময় আপনার জন,—
কোথা তারা—কোথা তারা,
সরে গেছে কুহকী মায়ায়,
শুধু আছে—
অন্তহীন শূন্য অন্ধকার!

ঝিল্লি ডাকে অহরহ,
জগতের দর্শন না লভি,—
'আয়, আয়, আয় ফিরে, রূপসী ধরণী!'
মাঝে মাঝে ফুকারিয়া উঠে,
শৃগাল পেচক আদি আতঙ্কে বুঝিবা,
আপনার অস্তিত্ব বুঝিতে,—
'ওরে আছি, মরি নাই,
আঁধারের মাঝে,
আর কতক্ষণ
রহিব, আলোক দাও,
হর অন্ধকার,
লভি মোরা জীবনের সাড়া!'

গগনে তারকারাজি,
ম্রিয়মাণ আলো
দিবারে প্রয়াস পায়,
জগতের বুকে ;
মেঘাবগুণ্ঠনে হায় সবা আঁখিতারা,
আবরিত,
তাও আজি কৃষ্ণময়
অকরুণ শ্রাবণ পরশে !

রূপহীনা ধরিত্রীর
বন্ধ আঁখি ঘেরি',
একাকী বসিয়া তাই,
চিন্তা আসে মনে,—
সব আছে, কিছু নাই,
এই বুঝি,
চির সত্য বাণী ;
অথবা শূন্যের মাঝে,
সব আছে মোর,
লভিবারে সে সবায়,
শুধু চাই জ্ঞানালোক—
আলো মনোরম।

অভিনন্দিত কুহেলী

নীল আকাশের শেষের সীমা,
দূরে অতি দূরে,
পশ্চিম দিগন্তের শেষে,
যেখানে সীমাহীন আকাশের
শেষ রেখা মিশেছে—
আর ধরণীর গড়িয়ে পড়া
শেষ দৃশ্যমান তটরেখা !

তাকিয়ে আছে নয়নের উদাস দৃষ্টি,
তাকিয়ে আছে,
শুধু তাকিয়ে আছে,—
চোখের দুটো মণি,
অর্ধ চেতনায় দেখছে,
কাছে যারা আছে,
দূরে যারা আছে,
তাদের রূপ
কেমন যেন
স্পষ্ট হতে মিশে যায় অস্পষ্টতায় !
অস্তপারের সূর্য জানায় তাদের অভিনন্দন।

*　　*　　*

মনের গোপনে আর এক নয়ন,
সেও চেয়ে থাকে
দূরদূরান্ত নীলিমায়—
রূপময়, রসময় প্রান্তরে
প্রাণবস্তুর অপরূপতায় !

নিকট দূরের কুহেলিকা দেখি
আর উদাসীন হ'য়ে ভাবি,—
বাইরের জগত,
রং মাখানো আলোর প্রখরতায়,
আর মৃদুতায়,
কতটুকু তার পরিচয়।
আর নিভৃত গোপন মনের নীলিমার
নিঃসীমতা—
তাদের পরিচয়ই বা কতটুকু।
মৃত্যুর পরশ জানায় তাদের অভিনন্দন।
ভেতর বাহির সব হ'য়ে যায় একাকার !

ইহপরানন্দ

নিস্তব্ধ চাঁদের রাত।
চতুর্থ প্রহর।
পূর্ণশশী ঢলে' পড়ে পশ্চিম প্রান্তিকে।
গ্রীষ্মকাল।
নিদ্রা যায় টুটে,
ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ আসে কানে।

পল্লীবধূ ননদীর সাথে
ঢেঁকিতে দিতেছে পাড়,
সিদ্ধধান কুটিতেছে তারা।
বধূর চরণাঘাতে,
তালে তালে ওঠা নামা করিতেছে ঢেঁকী!
লীলায়িত সর্ব অঙ্গ দুলিছে তন্বীর।
ননদী দক্ষিণ হস্তে
উখাড়িয়া দেয়,
বধূর চরণ তালে তালে
নোট-মুখে কোটা ধানগুলি;

ক্ষণিকের হোক তাও,
ইহাদের কর্মব্যস্ত সাকল্যের রূপ,

নির্জন স্তম্ভিত রাত্রে
ফুটাইছে প্রকৃতির ঐশ্বর্য সম্ভার !
নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রই।
অন্তরের চক্ষে ওঠে ফুটে,
গতিধর্মী প্রেম পরিচয় ।
সংসারের ভূমিকায়,
গ্রহণ করেছে ঢেঁকী আনন্দের রূপ,
কর্ম—গতিময়
বস্তুধর্মী প্রেম অবদান,
সুন্দরীর করস্পর্শে,
চরণের ললিত আঘাতে !

মৃত্যুশীল জগতের আনন্দ সভায়,
নিমন্ত্রিত আজি তারা।
সানন্দে করিছে পান,
পৃথিবীর কাচপাত্র হতে,
বিশ্বভরা পবিত্র আসব।
জড়ধর্মী ঢেঁকীটিরে মনে হয়,
ক্ষণিকের আনন্দের জীবন্ত প্রতীক।

তবু তার এইটুকু নয় পরিচয় !
মনোময় নারদের পশ্চাতে পশ্চাতে
স্বর্গে স্বর্গে করি' বিচরণ,

লভে কোন দিব্যক্ষণটিতে
অসীমের মহা আস্বাদন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অমর দেবতা,
দর্শনে সার্থক হয় ঢেঁকীর জীবন!

অনন্তের নিত্য সত্যটিরে,
এমনি লভিতে চায়,
নারদের পদপ্রান্তে আপনাকে রাখি।

বধূর চরণে রহি ক্ষণিকের সুখে,
মৃত্যুরে মানিয়া লয়, পুনঃ,
নারদ বাহন হ'য়ে,
অমৃতের করে সে সন্ধান।

ঢেঁকীরে হেরিয়া মনে পড়ে,
মৃত্যুশীল জগত সুন্দর।
অনন্ত অনাদি সেও,
শাশ্বত সুন্দর!
ঢেঁকী তাই,
বেঁধে দেয়,
মৃত্যুসাথে অমৃতের এ রাখীবন্ধন!
ক্ষণবুকে শাশ্বতীর সত্য মহাছবি।

মোহমুগ্ধ

গভীর অন্ধকারে যখন তাকিয়ে দেখি,
প্রভেদ পাইনে খুঁজে,
চোখ বোঁজা আর চোখ খোলায়।
তাই,
চোখ খোলার কষ্টকে বিদায় দিয়ে,
থাকি চোখ বুঁজে।

কতক্ষণ যায়,
তাকাইনে ;
যেন অনন্তকাল ধ'রে আমি অন্ধ।
ধরণীর রূপের ঐশ্বর্য,
সে যেন আমার নাগালের বাইরে ;
অধিকার নেই তাকে পাবার !
ইচ্ছাও জাগে না মনে।
খাঁচার পোষা পাখীর মত,
নিতান্ত নিশ্চিন্তে,
বরণ করে নেই অন্ধকারকে !
যেমন পরাধীন পাখী
মেনে নেয় তার খাঁচা।

ঘুমিয়ে যাই,
কখন যেন ঘুমিয়ে যাই,
নিশ্চিন্তের বিছানায়,
আর,
অন্ধকারের আবরণে সর্বাঙ্গ ঢেকে।

খাঁচার মালিকের হয় দয়া;
কখন যেন,
খুলে দেয় খাঁচার দ্বার!
কিন্তু আনন্দে
দাঁড়েই ব'সে থাকে পাখী,
বাইরে আসে না,
পাখার দেয় না ঝাপট।

হাসি ফোটে পূবের আকাশে—
তরল হয় আঁধার,
গান ওঠে নব উষার আগমনী।
মান্‌তে চায় না মন,
তাকাতে চায় না চোখ,
দেখতে চায় না বিশ্বের সৌন্দর্য,
বুঝতে পারে না আঁধারের আঘাত।

তবু ফর্সা হ'য়ে যায় আকাশ,
আলোকের ঝর্ণায়

স্নান করে পৃথিবী।
বুঁজে থাকে আমার চোখ,
যেন সুন্দরকে শিখেছে ভয় করতে।

আলোয় ভ'রে যায় আকাশ,
আলোয় ভ'রে যায় দিগন্ত,
আর অর্দ্ধ পৃথিবী।
আমি মোহমুগ্ধ, আমি অন্ধ!

আহ্বান সাধনা

চুপ করে' থাকা আর চেঁচিয়ে ডাকা
একই কথা।
যদি, যাকে ডাকছো,
সে না থাকে তোমার ডাকার নাগালের মধ্যে।

তাই বলি বন্ধু,
ডাকার আগে দেখে নাও খুঁজে নাও,
তোমার শব্দ-তীরের ফলা
তাকে করবে তো বিদ্ধ?

তুমি যাকে ডাকছো,
শুনতে পাবে তো তোমার আহ্বান ?

যদি না পায়,
চেঁচিয়ো না বন্ধু, চেঁচিয়ো না,
চুপ করে' থাকো,
ক্ষয় কোরো না তোমার শব্দ-শক্তিকে,
শব্দই তোমার আত্মা,
সে পরম সত্য,
তাকে ক'রো না তুমি মিথ্যা !

যে তোমার নাগালের বাইরে,
তাকে যদি চাও বন্ধু,
অন্তরের গোপনে,
তোমার আগল দেওয়া ঘরে,
একান্ত একমুখী আগ্রহে
স্তব্ধ আনন্দে আহ্বান করো।

নীরবে—নিভৃতে,
রবহীন-বাণীহীন ভাষায় বলো,—
এস এস সম্মুখে এসো, সম্মুখে এসো,
আমার আহ্বান-সাধনা
পৌঁছুতে দাও তোমার মনে।
সে আসবে, এ আহ্বানে সে আসবে,

যদি আসে, ডাকো,
আরও ডাকো, চেঁচিয়ে ডাকো,
সান্নিধ্যে এলে টেনে নাও তাকে,
আর বিলিয়ে দাও আপনাকে।
আর যদি না-ই আসে,
চুপ করে' চেয়ে থাকো,
চেয়ে থাকো তার প্রতীক্ষায়।
কতদিন?
যতদিন সে না আসে।

সমাপিকা

সমাপিকা, ওগো সমাপিকা,
অতনুর তনুর মতন তুমি চির মানসী-কল্পনা।
শীভবের বুক জুড়ে ফুটে-ওঠা-রামধনু,
ক্ষণিকের হোক তাও,
হোক তাহা রবি-রশ্মি-ছটা,
মিলাবার পূর্বক্ষণ অবধি বাস্তব।